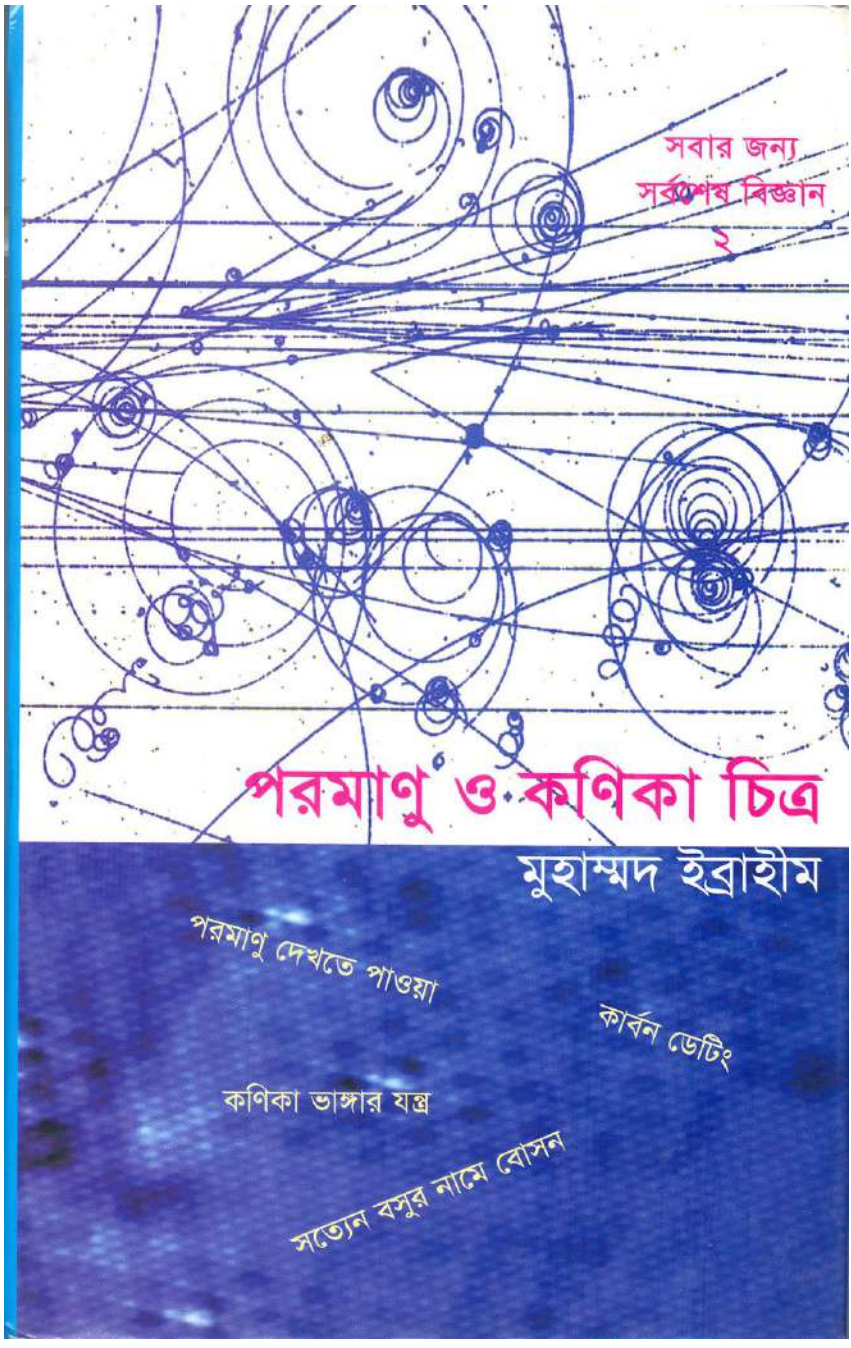
সবার জন্য
সর্বশেষ বিজ্ঞান
২
পরমাণু ও কণিকা চিত্র
মুহাম্মদ ইব্রাহীম
পরমাণু দেখতে পাওয়া
কার্বন ডেটিং
কণিকা ভাঙ্গার যন্ত্র
সত্যেন বসুর নামে বোসন

পরমাণুর ধারণাটি এসেছিলো একে বস্তুর মৌলিকতম উপাদান হিসেবে নিয়ে; এটম শব্দটির অর্থই হলো অবিভাষ্য। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে দেখা গেলো পরমাণুর মধ্যেই রয়েছে আরো মৌলিক কিছু কণিকা। নানা পরীক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে এর গঠন চিত্রটি উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলেছে এবং শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে। এসব ও এদের ফলশ্রুতিতে আজকের যে কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক চিত্র দাঁড়িয়েছে সেটি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা রয়েছে এই বইয়ে। পরমাণুর এই চিত্রই আজ উদ্ঘাটন করতে পারছে পরমাণুতে গড়া জগতের অনেক কিছুকে। পরমাণুর বাইরেও আবিষ্কৃত হয়েছে আরো বেশ কিছু মৌলিক কণিকা। সাম্প্রতিকতম বিজ্ঞান এসব কণিকা-বৈচিত্রের মধ্যে একটি সরল শৃঙ্খলা আনতে পেরেছে। ভৌত জগতকে এবং মহাবিশ্বকে বুঝতে এই শৃঙ্খলার অনুধাবনটি জরুরী।

প্রচ্ছদ চিত্র

নিচে: স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপে দেখা পরমাণু বিন্যাস।

উপরে: নূতন সৃষ্ট কিছু কণিকা বাবল চেম্বারে নিজেদের গতি পথের চিহ্ন রেখে গেছে।

পরমাণু ও কণিকা চিত্র

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

পরমাণু ও কণিকা চিত্র

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

উৎসর্গ

বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের (সিএমইএস) ব্যাপক
কর্মযজ্ঞে যারা সর্বক্ষণ নিজেদেরকে
নিয়োজিত রেখেছে তাদের উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে জগৎ-জীবন নিয়ে গ্রীক দার্শনিকদের অভাবনীয় অনুসন্ধিৎসা যে সময় চিন্তার রাজ্যে সোনা ফলাচ্ছে তখন কোন কোন দার্শনিকের মনে হয়েছে বস্তুমাত্রই হয়তো ক্ষুদ্রতম কিছু কণিকার সমষ্টি। বস্তুর গুণাগুণকে ঐ ক্ষুদ্রতমের মধ্যেই খুঁজতে হবে। পরমাণুর ধারণাটি সেই প্রথম এলো– ঠিক বিজ্ঞানের ভাষায় না হলেও দার্শনিকের ভাষায়। এরপর থেকে যুগে যুগে কোন কোন বিজ্ঞানী তাঁদের তত্ত্বে ধারণাটি নানাভাবে ব্যবহার করলেও এটি সুনির্দিষ্ট রূপ পায় আধুনিক রসায়নবিদদের মধ্যে প্রথম। কিন্তু পরমাণুর আদি যে ধারণাটি ছিল তার সেই অবিভাজ্যতাটি কিন্তু বেশিদিন আর রক্ষা করা গেলোনা। পদার্থবিদরা আবিষ্কার করলেন পরমাণুর নিজের মধ্যেই রয়েছে অন্য এক জগত– কিন্তু ঠিক কী রকম তার স্বরূপ চট করে জানা গেলনা। অথচ পরমাণুতে গড়া বৃহত্তর জগতকে ও সেখানকার ক্রিয়া-বিক্রিয়াকে বুঝতে গেলে পরমাণুর গঠন জানাটি জরুরী। একের পর এক পরীক্ষণ, তার ব্যাখ্যা, তাত্ত্বিক অনুমানের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা কীভাবে পরমাণুর প্রকৃত চিত্রে উপনীত হয়েছেন এই বই তার মূল প্রক্রিয়াগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। আজকের পরমাণু-চিত্রটি কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর ধারণাটি ঠিক আমাদের সাধারণ জ্ঞানের গ্রাহ্য না হলেও আগ্রহী পাঠক মাত্রই এক ভাবে তার মর্ম কথাটি বুঝার চেষ্টা করতে পারেন। এই বুঝার একটি বড় সার্থকতা রয়েছে; কারণ এভাবে আমরা পরমাণুতে গড়া বস্তুজগতের সর্বাধুনিক ব্যাখ্যাকে বুঝার চাবিকাঠি হাতে পেয়ে যাই, যার কিছুটা আমরা সিরিজের পরবর্তী বইটিতে দেখবো। এক পর্যায়ে বোঝা গেছে যুগ যুগ ধরে পরমাণুকে মৌলিক কণিকা বলে মনে করা হলেও আসলে এটি সব চেয়ে মৌলিক নয়। পরমাণু নিজেও তার চেয়ে আরো মৌলিক কণিকা দিয়ে গড়া। পরমাণুর বাইরেও পাওয়া গেছে এরকম অন্য ধরনের মৌলিক কণিকা যাদের সংখ্যা ও বৈচিত্র নেহাৎ কম নয়। মজার ব্যাপার হলো এদেরও কোন কোনটি নিজেরা একেবারে মৌলিক নয়– তাদের অন্তরালে রয়েছে মৌলিকতর আরো কিছু। মৌলিকতার সন্ধানে বিজ্ঞানের এই অভিযাত্রাটিও খুবই চমকপ্রদ। বিজ্ঞানী-রা চেষ্টা করেছেন মৌলিক কণিকার আপাত বৈচিত্র ও বিশৃঙ্খল গুণাগুণের মধ্যে একটি সুন্দর শৃঙ্খলা ও প্রতিসাম্য স্থাপন করতে; আর এতে তাঁরা চমৎকার ভাবে সক্ষম হয়েছেন। ভৌত জগতকে বুঝতে এবং মহাবিশ্বকে বুঝতে এই মৌলিক কণিকা ও তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাগুলো জানা খুবই আবশ্যক। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে আবিষ্কারের মাধ্যমে ঐ শৃঙ্খলায় বিরাট অবদান রেখে বোসন নামটিকে চিরতরে এর অঙ্গীভূত করেছেন, তাও এই বইয়ে আমাদের কাহিনীর অংশ।

আধুনিক জীবন ও আধুনিক মননশীলতাকে গড়ে তুলছে বিজ্ঞানের যে সব দিক সেগুলোর কোন কোনটির সংক্ষিপ্ত অথচ ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের চেষ্টা আমরা করবো 'সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞান' - এই পুস্তক সিরিজের বিভিন্ন বইয়ে।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচিপত্র

পরমাণুর গঠন ৯
পরমাণুর কেন্দ্র: নিউক্লিয়াস ২২
নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া, নিউক্লিয়ার শক্তি ২৬
মৌলিক কণিকার জগতে ৪১

পরমাণু ও কণিকা চিত্র
মুহাম্মদ ইব্রাহীম

পরমাণুর গঠন

পরমাণুর আদি ধারণা

প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার যুগে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ডেমোক্রিটাস নামের দার্শনিক প্রথম পরমাণুর ধারণা দিয়েছিলেন। তাঁর মতে সব বস্তু তৈরি হয় ক্ষুদ্র পরমাণু দিয়ে। বস্তুকে ভাগ করতে করতে ক্ষুদ্রতম যে অংশকে আর কাটা যাবেনা সেটিই হলো তার পরমাণু, ডেমোক্রিটাস যাকে গ্রীক ভাষায় বলেছেন এটম অর্থাৎ কাটার অযোগ্য। ডেমোক্রিটাসের ধারণা অনুযায়ী বস্তু জগতে শুধু পরমাণু আছে, আর পরমাণুগুলোর মাঝের ফাঁকা জায়গায় আছে শূন্য স্থান বা ভ্যাকুয়াম (সম্পূর্ণ বস্তুহীন)। তাঁর ধারণার সপক্ষে কোন প্রমাণ অবশ্য ডেমোক্রিটাস দেননি। তাঁর কালের এবং পরের সব দার্শনিক যে তাঁর কথা মেনে নিয়েছিলেন এমনো নয়। বহুদিন পর অষ্টাদশ শতকে যখন আধুনিক বিজ্ঞানের ধ্যান ধারণা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তখন নিউটন আলোকে বিচ্ছিন্ন কণায় গড়া মনে করেছিলেন এবং তার ভিত্তিতে আলোক বিজ্ঞানের অনেক কিছুর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি এক্ষেত্রে পরমাণুর ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। নিউটনের সমসাময়িক এবং পরবর্তী কোন কোন বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা এমনিভাবে পরমাণুর ধারণা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

তবে বস্তুর মৌলিক উপাদান হিসেবে আধুনিক বিজ্ঞানে সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে অনেকটা ডেমোক্রিটাসের এটমের আদলে পরমাণুর ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন রসায়নবিদ জন ডালটন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। তিনি রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোকে এই পরমাণুর ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক মৌলিক পদার্থ বা মৌলের নিজস্ব পরমাণু রয়েছে যার সবই একই রকম, একই ভরের, ও একই আয়তনের। এগুলো অতি ক্ষুদ্র এবং অবিভাজ্য। মৌল বা মৌলিক পদার্থ হলো সেই সব পদার্থ যার মধ্যে শুধু সেই একই পদার্থ রয়েছে। দুই বা ততোধিক মৌল মিলে অবশ্য অন্য রকম পদার্থ– যৌগিক পদার্থ – গঠন করতে পারে। বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর ভর, আয়তন ইত্যাদি আলাদা। এভাবে বস্তুর মৌলিক উপাদান হিসেবে পরমাণুর ধারণা প্রথম কিছু বাস্তব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় কাজে আসলো।

অবিভাজ্যতার অবসান

ডালটনের রসায়নবিদ্যার বিবেচনায় পরমাণু অবিভাজ্য থেকে তার এটম নামটি সার্থক রাখলেও খুব বেশি দিন কিন্তু এই অবস্থা বজায় থাকেনি। সেই উনবিংশ শতাব্দীতেই পদার্থবিদরা পরমাণু থেকে নানা ভাঙ্গা অংশ নির্গত হবার আলামত পেয়েছেন নানা ধরনের পরীক্ষায়। এক পর্যায়ে বায়ুশূন্য কাচ নলের মধ্যে নানা রকম বৈদ্যুতিক পরীক্ষা চলছিল যাতে খুব উত্তপ্ত কোন ধাতব তার থেকে এমন রশ্মি নির্গত হতে দেখা গেছে যা ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জে গড়া বলে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। পরে এভাবে পরমাণু থেকে নির্গত হওয়া রশ্মিতে ইলেকট্রন কণিকা আবিষ্কৃত হয়েছে যার ভর ও আয়তন পরমাণু থেকে অনেক কম। ইতোমধ্যে তখনই কিছু কিছু বিশেষ মৌলিক পদার্থে তেজষ্ক্রিয়তার গুণ আবিস্কৃত হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে এরকম পদার্থ থেকে এমন কিছু রশ্মি নির্গত হয় যার কোনটি ধনাত্মক চার্জযুক্ত কণিকায় গড়া, কোনটি ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কণিকায় (ইলেকট্রনে) গড়া। সবই ঐ পদার্থের পরমাণুর চেয়ে অনেক কম ভরের, যদিও ধনাত্মক কণিকাগুলো ইলেকট্রনের তুলনায় অনেক বেশি ভরের। অন্য কিছু আবিষ্কারের মাধ্যমে বেশ কিছু দিন আগে থেকেই বুঝা যাচ্ছিল যে পরমাণুর মধ্যেই কোন না কোন ভাবে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক চার্জ বন্টিত হয়ে আছে। এই সিরিজের আগের বইয়ে কাচের দন্ড ঘষে তার মধ্যে বৈদ্যুতিক চার্জ লক্ষ্য করার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এভাবে ঘষার ফলে চার্জযুক্ত কণিকা পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসে। এসবের অর্থ পরমাণু মোটেই অবিভাজ্য নয়, বরং এটি নানা ক্ষুদ্রতর কণায় গড়া। এই অর্থে পরমাণুকে আর পদার্থের একেবারে মৌলিকতম রূপ মনে করা যায়না। ঐ নির্গত কণিকাগুলো পরমাণুর অংশ এবং পরমাণুর থেকে বেশি মৌলিকতার দাবী করতে পারে। স্পষ্টত ডেমোক্রিটাস অথবা ডালটনের ধারণাতে যেমনটি ছিল পরমাণু সেরকম একটি নিরেট ক্ষুদ্র বলের মত নয়, বরং এর নিজেরও একটি গঠন আছে। প্রশ্ন উঠলো সেই গঠনটি কী?

পরমাণু-চিত্র খাড়া করার প্রচেষ্টা

পরমাণুর নানা আচরণের সঙ্গে সঙ্গতি সম্পন্ন হবে এমন শর্তে পরমাণুর ভেতরের চিত্রকে নানাভাবে কল্পনা করার চেষ্টা হলো। যেমন একটি চিত্রকল্প দেয়া হলো পরমাণু যেন কিসমিস দেয়া পুডিং এর মত। পুডিংটি হলো ধনাত্বক চার্জের আর কিসমিসগুলো ঋণাত্মক ইলেকট্রন যেগুলো পুডিং এর ভেতর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে

এবং সেভাবে পরমাণুকে সার্বিক ভাবে চার্জ নিরপেক্ষ রাখছে। শিগ্‌গির দেখা গেল এই চিত্র পরীক্ষার ধোপে টেকেনা। কিন্তু এরপর এর্নষ্ট রাদারফোর্ড বিখ্যাত একটি পরীক্ষার মাধ্যমে পরমাণুর যে গঠনের প্রস্তাব রাখলেন সেটি বেশ বিস্ময়কর হলেও প্রকৃত অবস্থার অনেক কাছাকাছি বলে প্রমাণিত হলো।

রাদারফোর্ডের পরীক্ষাটিতে তিনি খুব পাতলা ফিনফিনে একটি সোণার পর্দাকে তেজষ্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত আলফা রশ্মি দিয়ে আঘাত করলেন। তিনি দেখতে চাচ্ছিলেন যে এত পাতলা ধাতব পর্দার মধ্য দিয়ে রশ্মিটি কি চলে যায়, না তাতে শোষিত হয়, নাকি প্রতিফলিত হয়। আসলে আলফা রশ্মি নামে পরিচিত এই রশ্মি ধনাত্মক কণিকা হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে সৃষ্ট। অর্থাৎ এর ভর খুব ছোট একটি পরমাণুর সমান, আর এর চার্জ হলো দুটি ইলেকট্রনের চার্জের সমান কিন্তু বিপরীত (ধনাত্মক)। পরীক্ষাটিতে রাদারফোর্ড সোণার পর্দার প্রায় চারিদিক ঘিরে আলফা কণিকা উদ্ঘাটনের জন্য ফ্লোরোসেন্ট পর্দা বসিয়েছিলেন যাতে করে সোণার পর্দার মধ্যে যাবার পর কণাগুলোর কত অংশ কোথায় যায় তা নির্ণয় করা যায়। ফলাফল আসলো খুবই অদ্ভূত।

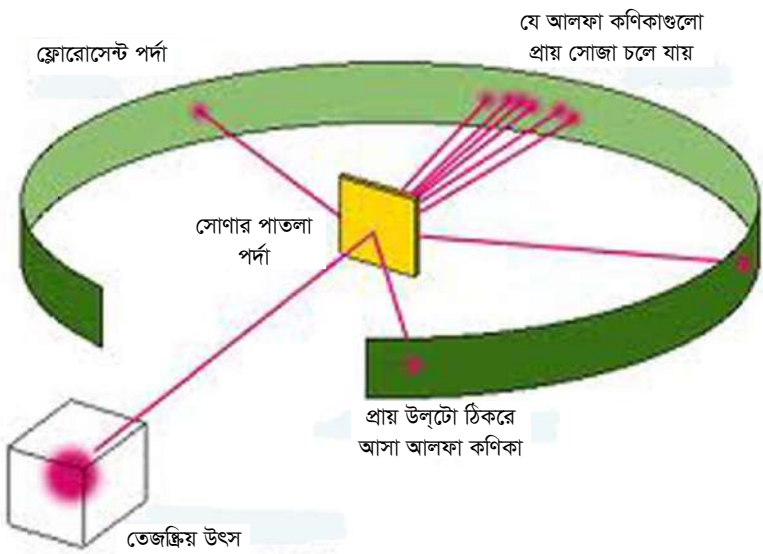

রাদারফোর্ডের সোণার পাতলা পর্দা পরীক্ষা

অধিকাংশ কণা পাতলা পাত ভেদ করে সোজা চলে গেল– চলার পথে তেমন বিচ্যুত না হয়ে। কিন্তু হঠাৎ অল্প কিছু কিছু কণা সোণার পর্দায় গিয়ে প্রায় উল্টো ফিরে আসে যেন সাংঘাতিক ভাবে কিছু দ্বারা বিকর্ষিত হয়েছে। ব্যাপারটি যে খুবই অদ্ভুত তা বুঝা যাবে যদি তুলনীয় একটি উপমা নেয়া যায়। অতি পাতলা

সোণার অতি ফিনফিনে পাতলা পর্দা আর আলফা কণিকার মত ক্ষুদ্র জিনিস মনে না করে যদি এদেরকে একটি কাগজের পাতা আর কামানের গোলা মনে করি, তা হলে ফলাফলটিকে তুলনা করতে পারি এক একটা কামানের গোলা কাগজে ধাক্কা খেয়ে প্রায় সোজা ফেরৎ আসার সঙ্গে! রাদারফোর্ড একে ব্যাখ্যা করতে পারলেন এই বলে যে পরমাণুর ভেতরে সিংহভাগ জায়গাই একেবারে শূন্য স্থান। অধিকাংশ আলফা কণিকার তাই এই খালি জায়গার ভেতর দিয়ে বিনা বাধায় চলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পরমাণুর মধ্যস্থলে থাকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয়তনের একটি ধনাত্মক চার্জের নিউক্লিয়াস বা পরমাণুকেন্দ্র– পরমাণুর প্রায় পুরোটা ভর এবং সব ধনাত্মক চার্জ যার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ নিউক্লিয়াস হচ্ছে পরমাণুর খুব ঘন এবং ধনাত্মক ছোট্ট কেন্দ্রীয় অংশ। কচিৎ যে সব আলফা কণিকা সোজা নিউক্লিয়াসের উপর গিয়ে পড়ে অথবা তার খুব কাছে দিয়ে যায়, আলফা কণিকা নিজেও ধনাত্মক বলে সেগুলো সজোরে বিকর্ষিত হয়ে ফিরে আসে। তা হলে পরমাণুর ঋণাত্মক কণিকা ইলেকট্রনগুলো কোথায় থাকে? নিজেরা স্থির থাকলে সেগুলো নিউক্লিয়াসের আকর্ষণে সেখানে গিয়ে জমবে এবং পরমাণু ঐ নিউক্লিয়াসে একাকার হয়ে যাবে এবং হয়ে পড়বে খুবই সংকুচিত। তা যখন হয়না তা হলে ধরে নিতে হবে যে ইলেকট্রনগুলো নানা কক্ষপথে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে পরিক্রমণ করেই পরমাণুর আকার বজায় রাখছে– গ্রহগুলো যেমন সূর্যের চারিদিকে নানা কক্ষপথে ঘুরে সৌরজগতের বৃহৎ আকার আয়তন বজায় রাখে। রাদারফোর্ডের দেয়া পরমাণুচিত্রটিকে তাই এই উপমার কারণে বলা যায় সৌর মণ্ডল চিত্র।

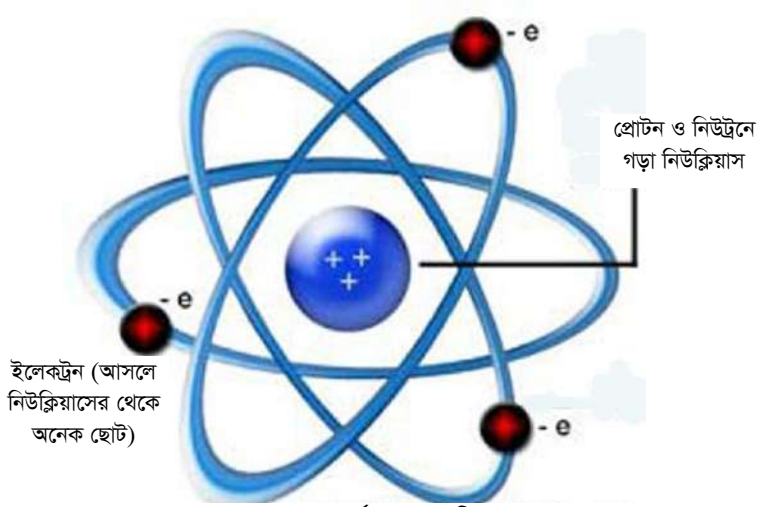

রাদারফোর্ডের পরমাণু চিত্র

পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন যে ঘুরছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও রয়েছে। যেমন বস্তুর যে চৌম্বক গুণাগুণ রয়েছে ঘুরন্ত ইলেকট্রনকে একটি কারেন্টের লুপ বা বর্তনী হিসেবে নিয়ে সেটি ব্যাখ্যা করা যায়। এরকম বর্তনীতে বৈদ্যুতিক কারেন্ট যে চুম্বকের মত আচরণ করে তা তো আমরা জানি। এটি পরমাণুর বেশ গ্রহণযোগ্য একটি মডেল। কিন্তু এতেও কিছু বিপত্তির বিষয় ধরা পড়লো। পরিক্রমণশীল ইলেকট্রন মানে হলো এই ইলেকট্রনগুলো সারাক্ষণ ত্বরণের অবস্থায় রয়েছে, আর আমরা দেখেছি– কীভাবে কোন বৈদ্যুতিক চার্জ ত্বরণের অবস্থায় থাকলে তা বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ বিকিরণ করবে (সিরিজের প্রথম বই দ্রষ্টব্য)। পরমাণুর ঘুরন্ত ইলেকট্রন এভাবে বিকিরণ করে ক্রমে শক্তি হারিয়ে ক্রমাগত তার কক্ষপথ ছোট করে প্যাচানো পথে (স্পাইরাল) শিগ্‌গির কেন্দ্রে নিউক্লিয়াসের উপর গিয়ে পড়বে। এতেও পরমাণুর আকার আয়তন রক্ষিত থাকার কথা নয়, অথচ বাস্তবে পরমাণুর আকার আয়তন খুবই স্থায়ী ব্যাপার।

বাস্তবে পরমাণু বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গের যে বিকিরণ দেখা যায় যা খুব সুনির্দিষ্ট কিছু ফ্রিকোয়েন্সির, এবং এক একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর জন্য তা একেবারেই সুনির্দিষ্ট। এমন একটি পদার্থকে উত্তপ্ত করে বা অন্য কোন ভাবে উত্তেজিত করলে তার পরমাণুর বিকিরণ বর্ণালীতে ঐ ফ্রিকোয়েন্সিগুলোর তরঙ্গ ধরা পড়ে। যেমন সোডিয়াম লাইটে সোডিয়ামের পরমাণুকে উত্তেজিত করা হলে তার বর্ণালীতে পাশাপাশি দুটি হলুদ আলোর লাইন দেখা যায় – খুবই নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির। এই ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যার জন্য নীলস বোর কিছুটা কোয়ান্টাম তত্ত্বের আদলে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে নূতন নিয়ম দেবার চেষ্টা করলেন। তিনি বল্‌লেন যতক্ষণ পর্যন্ত না পরমাণুতে ইলেকট্রন কতগুলো বৈধ কক্ষপথে থাকবে ততক্ষণ এদের থেকে ত্বরণ জনিত কোন বিকিরণ হবেনা। এক একটি শক্তি অবস্থায় থাকা ইলেকট্রন এরকম এক একটি বৈধ কক্ষপথে থাকে। সবচেয়ে কম শক্তির কক্ষটি নিউক্লিয়াসের সব চেয়ে কাছে, তারপরেরটি একটু দূরে, আরো শক্তিশালীটি আরো দূরে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী এদের প্রত্যেকটির জন্য একটি পূর্ণ সংখ্যক ক্রমিক সংখ্যা নির্ধারিত হলো যাকে বলা হলো কোয়ান্টাম নম্বর $n = ১,২, ৩ \ldots$ ইত্যাদি। নিউক্লিয়াসের সব চেয়ে কাছেরটির কোয়ান্টাম নম্বর $n = ১$, যার অবস্থাটিকে গ্রাউন্ড ষ্টেট বা সর্বনিম্ন অবস্থাও বলা হয়। এর চেয়ে শক্তিমানগুলো হতে পারে শুধু $n = ২$, বা $n = ৩$, ইত্যাদি দ্বারা নির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট শক্তির কক্ষপথে।

পরমাণুকে উত্তেজিত করলে কোন ইলেকট্রন উত্তেজনার শক্তি লাভ করে উচ্চতর কোন কক্ষপথে সাময়িক ভাবে যেতে পারে বটে কিন্তু শিগ্‌গির একে পূর্বতন নিম্নতর কক্ষে ফেরৎ আসতে হয়। এটি করতে গিয়ে এই দুই কক্ষপথের শক্তির পার্থক্য অনুযায়ী একটি বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সির বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ এটি বিকিরণ করে। নিয়মটি কোয়ান্টাম তত্ত্ব দ্বারাই নির্ধারিত। হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালীতে বিকীর্ণ আলোর যে সব ফ্রিকোয়েন্সি ইতোমধ্যে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার মাধ্যমে জানতেন তার সঙ্গে নীলস বোরের এই নিয়মে হিসেব করা ফ্রিকোয়েন্সি এত সুন্দর ভাবে মিলে গেল যে আপাতত এই তত্ত্বকে বেশ সফল বলে মনে হলো।

এখানে কোয়ান্টাম তত্ত্বের যে নিয়মটি ব্যবহৃত হচ্ছে তা হলো:

উচ্চতর কক্ষের শক্তি - নিম্নতর কক্ষের শক্তি = h × বিকীর্ণ ফ্রিকোয়েন্সি

h মানে সেই প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক, যার সাক্ষাৎ আমরা সিরিজের আগের বইটাতে কোয়ান্টাম তত্ত্বের আলোচনায় পেয়েছি। পদার্থবিদ্যায় একটি নিয়ম আছে যে

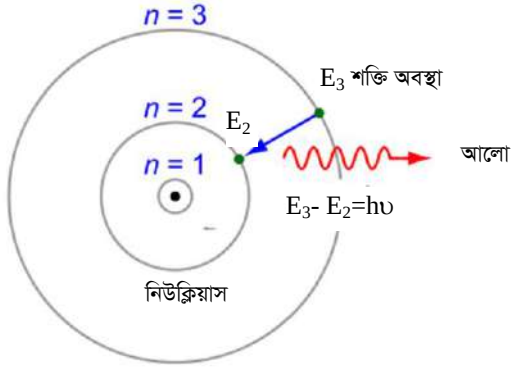

নীলস বোরের পরমাণু চিত্র। উচ্চতর শক্তি অবস্থা থেকে নিম্নতর শক্তি অবস্থায় ইলেকট্রন গেলে উভয়ের শক্তির পার্থক্য অনুযায়ী নির্ধারিত ফ্রিকোয়েন্সিতে আলো নির্গত হয়। সমীকরণটিতে υ আলোর ফ্রিকোয়েন্সি সূচিত করছে।

সব কিছু নিম্নতম স্থৈতিক শক্তিতে থাকতে চায়। সেই হিসেবে পরমাণুর সব ইলেকট্রন নিম্নতম কক্ষপথেই থাকার কথা কারণ তার শক্তি সবচেয়ে কম। তা হলে উচ্চতর কক্ষগুলোতেও কিছু কিছু ইলেকট্রন থাকে কেন? এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন উল্‌ফগ্যাং পাউলি তাঁর বর্জন নীতির মাধ্যমে। তিনি দেখালেন যে কোন দুটি ইলেকট্রন একই কোয়ান্টাম অবস্থায় থাকতে পারে না। ঐ অবস্থার কক্ষটি একটি ইলেকট্রন দিয়ে দখল হয়ে গেলে অন্য ইলেকট্রনকে এই কক্ষকে বর্জন করে উচ্চতর কক্ষে যেতে হয়। তবে কোয়ান্টাম নম্বর n এর যে কক্ষ তাতে একের অধিক কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেকট্রন থাকতে পারে

n এর মান অনুযায়ী। এর কারণ n ছাড়াও অন্যান্য কিছু কোয়ান্টাম নম্বর রয়েছে যা ইলেকট্রনের অন্যান্য বিভিন্ন গুণ সূচিত করে– যেমন কোনটি তার কৌণিক ভরবেগ, কোনটি তার নিজের অক্ষের উপর ঘূর্ণন (স্পিন) ইত্যাদি। কাজেই n এক হলেও ঐ কক্ষের বিভিন্ন ইলেকট্রন অন্য কোয়ান্টাম নম্বরে আলাদা, এগুলো হুবহু একই অবস্থায় নেই, তাই বর্জন নীতি লঙ্ঘন করছেনা। এজন্য একই n বিশিষ্ট কক্ষে এরা কয়েকটি থাকতে পারে।

নীল্‌স বোর পরমাণুর গঠনের এই যে তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন পরীক্ষণলব্ধ তথ্যের ব্যাখ্যায় তা চমৎকারভাবে কাজ করছিল। কিন্তু এটি কাজ চলার জন্য ভাল হলেও তাত্ত্বিক বিশুদ্ধতার জন্য এবং সূক্ষ্মতর ও সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য যথেষ্ট ছিলনা। পরবর্তীতে আবিষ্কৃত কোয়ান্টাম গতিবিদ্যাই পারলো পরমাণুর সর্বাধুনিক গঠন চিত্র এনে দিতে।

কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার নিরিখে পরমাণুর গঠন

সিরিজের আগের বইয়ে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার আলোচনায় আমরা দেখেছি অনিশ্চয়তার নীতি অনুযায়ী অবস্থান সুনির্দিষ্ট হলে কোন কণিকার ভরবেগ খুব অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ক্ষুদ্র কণিকা ভরবেগকে সাংঘাতিক অনিশ্চিত না করে একটি সুনির্দিষ্ট জায়গায় বা কক্ষপথে থাকতে পারে না। তাই কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার আলোকে ইলেকট্রনের পক্ষে কক্ষ পথের একেবারে সুনির্দিষ্ট স্থান দিয়ে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে পরিক্রমণ করার উপায় রইলোনা।

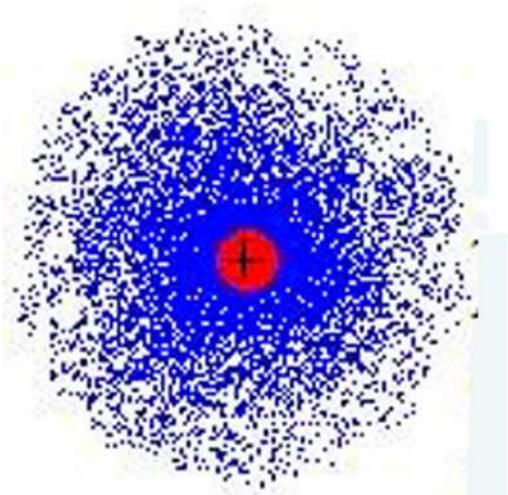

হাইড্রোজেন পরমাণুর কোয়ান্টাম তত্ত্বীয় চিত্র। কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস। চারিদিকে ইলেকট্রন মেঘ। মেঘ যেখানে বেশি ঘন, ইলেকট্রনের থাকার সম্ভাবনা সেখানে বেশি। মনে রাখতে হবে যে হাইড্রোজেন পরমাণুর রয়েছে একটিই ইলেকট্রন।

বরং শ্রোয়েডিঙ্গারের সমীকরণ অনুযায়ী ইলেকট্রনের ওয়েভ ফাংশন দিয়েই ইলেকট্রনের হদিশ নিতে হবে, এবং তা হাইড্রোজেনের মত সরল পরমাণুর ক্ষেত্রে খুব ভাল ভাবেই হিসেব করে বের করা যায়। এই ওয়েভ ফাংশন দ্বারা নির্ধারিত এক রকম ইলেকট্রন মেঘ পরমাণুর মধ্যে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে যার তীব্রতা এক এক জায়গায় তার ওয়েভ ফাংশন অর্থাৎ ইলেকট্রনের অবস্থানের সম্ভাবনা বলে দেয়।

বোরের পরমাণু চিত্রে আমরা n এই কোয়ান্টাম নম্বরটিকে শক্তি মাত্রা সূচিত করতে দেখেছি। ইলেকট্রনের অবস্থান সম্ভাবনা সূচক ঐ মেঘের মাধ্যমে বোরের চিত্রটি পাল্টে গেলেও তাঁর তত্ত্ব এক্ষেত্রেও কিছুটা সহায়ক হয়েছে। এখানে n কে বলা হলো মুখ্য কোয়ান্টাম নম্বর যা মোট শক্তি সূচিত করে। কিন্তু n= ১,২,৩. . . করে প্রত্যেকটি n এর আওতায় থাকে আরো তিন রকমের গৌণ কোয়ান্টাম নম্বর। বোর তত্ত্বের কক্ষ বা অরবিটের অনুকরণে আধুনিকতর তত্ত্বেও গৌণ কোয়ান্টাম নম্বর অনুযায়ী পৃথক হওয়া ইলেকট্রন মেঘকে বলা হলো অরবিটাল। কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার পরমাণু-চিত্র অনুযায়ী শ্রেয়েডিঙ্গারের সমীকরণ থেকে হিসেব করে মোট শক্তি বের করলে আমরা বিভিন্ন n এর জন্য যে শক্তি পাই তা বোর তত্ত্বের পাওয়া ফলের সঙ্গে মিলে যায়। কাজেই কক্ষের ধারণাটি অন্তত নামকরণের ক্ষেত্রে রেখে দেয়াটি খুব অন্যায় কিছু নয়।

নূতন তত্ত্বে একটি গৌণ কোয়ান্টাম নম্বর হলো ℓ। এই গোটা সংখ্যাকে বলা হলো আরবিটাল কোয়ান্টাম নম্বর। এর সঙ্গে সম্পর্ক হলো ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগের।

n এর একটি নির্দিষ্ট মান এর দ্বারা সূচিত একটি মুখ্য অবস্থার মধ্যেই ℓ এর বিভিন্ন মান নিয়ে কয়েকটি গৌণ অবস্থা থাকতে পারে। এর সর্বোচ্চ ℓ এর মান হবে ℓ = n - ১, যেহেতু ℓ = o একটি মান তাই একটি n এর অধীনে কতটি ℓ থাকবে তার সংখ্যা হবে n । এর কারণ তখন ℓ = o, ১, ২, ... n - ১। উদাহরণ স্বরূপ n যদি ৩ হয় তাহলে ℓ গুলো হবে ℓ = o, ১, ২; মোট তিনটি। ℓ = o, হলে সেই অরবিটালকে বলা হয় s, ℓ = ১ হলে তাকে বলা হয় p, ℓ = ২ হলে তাকে বলা হয় d ইত্যাদি। প্রত্যেক অরবিটালে ২(২ℓ +১) সংখ্যক ইলেকট্রন বৈধভাবে থাকতে পারবে। কাজেই n=১ এর জন্য একটিই অরবিটাল রয়েছে যা কিনা ℓ = o। আর তাতে থাকতে পার ২টি ইলেকট্রন। এই অরবিটালের পুরো ব্যাপারটিকে লেখা হয় $1s^2$ এই ভাবে। এখানে 1 বুঝাচ্ছে

মুখ্য কোয়ান্টাম নম্বর n এর মান হলো ১, অর্থাৎ এটি সর্ব নিম্ন মোট শক্তির অবস্থা; তাই এর মধ্যে গৌণ অরবিটাল রয়েছে একটি এবং তা হলো s অরবিটাল অর্থাৎ কিনা $\ell = 0$। এ অবস্থার কৌণিক ভরবেগ এর দিয়েই সূচিত; এই অরবিটালে সর্বোচ্চ দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারবে। এ জন্য s লিখে তার মাথায় 2 লেখা হয়েছে। একই ভাবে n=২ এর দুটি অরবিটাল সম্ভব $2s^2$ এবং $2p^6$। দুটি অরবিটাল মিলে n=২ তে মোট ইলেকট্রন থাকতে পারবে ৮ টি। আর এমনিভাবে চলতে থাকবে। এই বিভিন্ন অরবিটালে বিভিন্ন শক্তি অবস্থায় থাকা ইলেকট্রনের ভূমিকা রয়েছে পরমাণুর বিভিন্ন গুণাগুণে। যেমন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভূমিকা রয়েছে প্রধানত একেবারে বাইরের দিকের অরবিটালগুলোর। পরমাণু থেকে বিকিরণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রয়েছে বিভিন্ন অরবিটালের মধ্যে ইলেকট্রন স্থানান্তরের, ইত্যাদি। তাই কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার মাধ্যমে পরমাণুর এই চিত্রের ভিত্তিতে হিসেব নিকেশের উপরেই এ সবকিছু নির্ভর করছে। পরমাণুতে ইলেকট্রনের কোয়ান্টাম নম্বর কিন্তু n এবং ℓ এই দুটিতে সীমাবদ্ধ নয়। আরো দুটি কোয়ান্টাম নম্বরকে হিসাবে আনতে হয়: একটি হলো ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নম্বর m এবং আরেকটি হলো স্পিন কোয়ান্টাম নম্বর m_s। একটি ইলেকট্রন পরমাণুতে কোন অবস্থায় থাকবে তার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনার জন্য এই চারটি কোয়ান্টাম নম্বরই আমাদের প্রয়োজন হবে। আপাতত শেষ দুটি সম্পর্কে আমরা আলোচনায় গেলামনা।

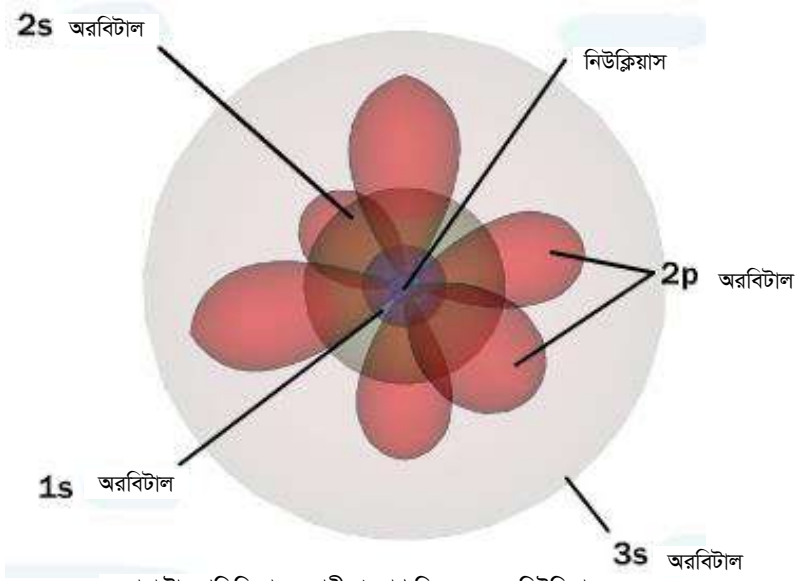

কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা অনুযায়ী পরমাণু চিত্র। কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস, তার চারিদিকে বিভিন্ন অরবিটালে ইলেকট্রন মেঘ।

ঐ যে অরবিটালগুলো $1s^2$, $2s^2$, $2p^6$, ইত্যাদি এরা কিন্তু কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার আলোকে ঠিক সুনির্দিষ্ট গোটা গোটা ইলেকট্রনকে সূচিত করেনা আসলে। তাদেরকে বরং আমাদের দেখতে হয় সম্ভাবনার তরঙ্গের রূপে যাকে কিনা বিভিন্ন ঘনত্বের ও আকার-আকৃতির সম্ভাবনা-মেঘ হিসেবেই আমরা চিত্রায়িত করতে পারি। ঐ মেঘই হলো ইলেকট্রন, আর মেঘরূপী ইলেকট্রন ধারণ করা অরবিটালগুলোর আকার আকৃতি নির্ভর করছে সেই অরবিটালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শক্তি, কৌণিক ভরবেগ ইত্যাদির উপর অর্থাৎ প্রকারান্তরে নানা কোয়ান্টাম নম্বরের উপর। এটিই পরমাণুর সর্বাধুনিক চিত্র– নানা আকার আকৃতির ইলেকট্রন মেঘ সহ কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াসকে নিয়ে।

পরমাণু কীভাবে দেখতে পারি?

আদিতে পরমাণু তত্ত্ব যারা দিয়েছেন, আরো সাম্প্রতিক কালে পরমাণুর গঠনসহ এর অনেক বিস্তৃত গুণাগুণ যাঁরা উদ্ঘাটন করেছেন তাঁরা কেউ কিন্তু সরাসরি পরমাণু দেখে তা করেননি। বরং পরোক্ষভাবে এর নানা আচরণ থেকেই এসব আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। কারো পক্ষেই পরমাণু দেখা সম্ভব ছিলনা কারণ এর আয়তন অত্যন্ত ছোট– গড়পড়তা ব্যাস এক মিলিমিটারের এক কোটি ভাগের এক ভাগ। সাধারণ মাইক্রোস্কোপ দিয়ে তো নয়ই, আরো অনেক শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়েও এত ক্ষুদ্র জিনিসকে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে **১৯৮১** সালে এমন একটি নূতন কৌশলের মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কৃত হয়েছে যে যার ফলে সত্যি সত্যি পরমাণু দেখার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এর নাম স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপ বা এস টি এম। এতে খুবই সূঁচালো একটি পিনকে পরমাণু গঠিত তলের উপর বুলিয়ে গিয়ে কম্পিউটার পর্দায় পরমাণুকে দৃশ্যমান করা যায়।

শক্ত ধাতু টাংষ্টেন ইত্যাদিতে তৈরি খুব সূঁচালো অগ্রভাগ সম্পন্ন পিনকে এতে রাখা হয় একটি পিজো-ইলেকট্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে। পিজো-ইলেকট্রিক গুণ সম্পন্ন স্ফটিকাকার বস্তুকে খুব সামান্য চাপ বা টানের অবস্থায় আনা হলেও এর থেকে একটি বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ বা সিগন্যাল পাওয়া যায়। আবার বৈদ্যুতিক সিগন্যাল প্রয়োগ করে ও তা বদলিয়ে এর সংলগ্ন পিনকে সূক্ষ্মভাবে উঠানামা করানো যায়। আগে আমরা গান শুনতে যে রেকর্ড প্লেয়ার ব্যবহার করতাম সেখানেও পিনটি এরকম একটি পিজো-ইলেকট্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে থাকতো। সে ক্ষেত্রে পিনটি রেকর্ডের গর্তরেখার উঁচুনিচু জায়গা অনুসারে যে চাপ অনুভব

করতো সে হিসাবে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল দিত যা মূল সঙ্গীতের শব্দ কম্পনে পরিণত হতে পারতো। এর সঙ্গে এস টি এম এর ব্যবস্থাটির কিছু মিল আছে। তবে এক্ষেত্রে ব্যাপারটি উল্টো। বুলিয়ে যাওয়ার সময় পিজো-ইলেকট্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন ভোল্টেজ সরবরাহ করার মাধ্যমে পিনকে সূক্ষ্ম ভাবে উঠানো বা নামানো হয়।

এস টি এমএ কিছু ইলেকট্রনিক্স ব্যবস্থা থেকে পিনের অগ্রভাগে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ সরবরাহ করা হয়। বুলিয়ে যাওয়ার জন্য একটি স্ক্যানিং ব্যবস্থা দ্রুত পিনটিকে পরমাণু গঠিত তলের উপর স্পর্শ না করে কিন্তু অত্যন্ত কাছে থেকে বুলিয়ে যায়। স্পর্শ না করার এই অবস্থাতেও কিন্তু পিনের অগ্রভাগ থেকে তলের পরমাণুর মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রভাব বিস্তৃত হয়। পিনের অতি সূঁচালো অগ্রভাগ যখন দুই পরমাণুর মাঝখানের গর্ত হয়ে থাকা অংশ থেকে পার হয়ে একটি পরমাণুর উপরে এসে হাজির হয় পিন থেকে পরমাণুতে যাওয়া বৈদ্যুতিক প্রভাবে পরিবর্তন ঘটে। ব্যাপারটি ঘটে কোয়ান্টাম টানেলিং প্রক্রিয়ার – যা আমরা সিরিজের আগের বইটিতে কোয়ান্টাম তত্ত্বের আলোচনায় দেখেছি।

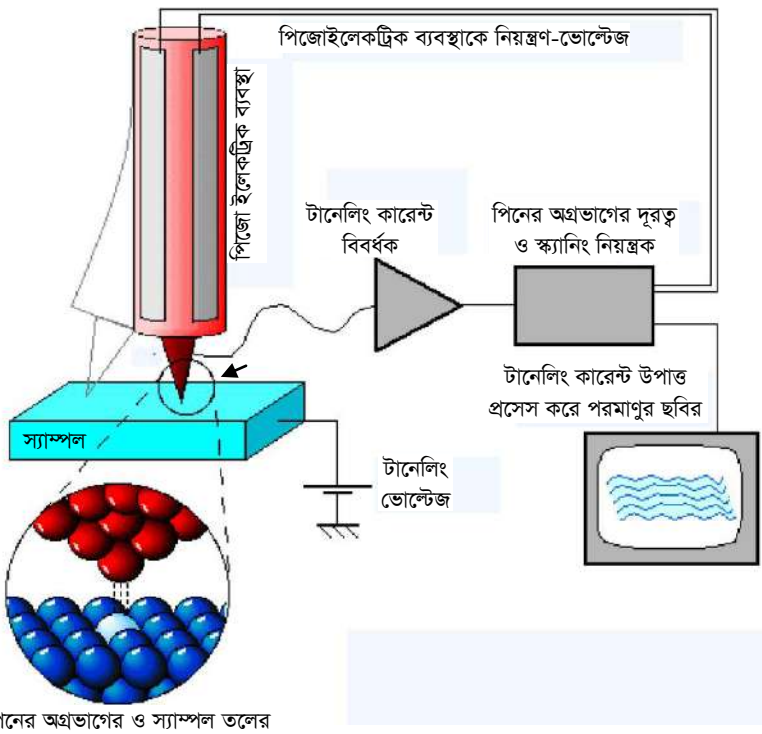

পিনের অগ্রভাগের ও স্যাম্পল তলের পরমাণুগুলোর পারস্পরিক অবস্থান (কাল্পনিক বিবর্ধিত রূপ)

পরমাণু দেখার জন্য স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপ

এতে পিনের বৈদ্যুতিক চার্জে তলের সঙ্গে এর ব্যবধানের মধ্য দিয়ে যাওয়ার মত শক্তি না থাকলেও দূরত্ব যখন খুবই কমে যায় তখন কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তার সুযোগে কিছু চার্জ তথাকথিত টানেলিং এর মাধ্যমে এ ভাবে তলের পরমাণুতে যাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এর ফলে সৃষ্ট পরিবর্তিত কারেন্ট কম্পিউটারে ধরা পড়ে। এই টানেল কারেন্ট কিন্তু পিনের উঠা নামার উপর খুবই সংবেদনশীল ভাবে নির্ভর করে। পিজো-ইলেকট্রিক ব্যবস্থা কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত হয়ে যুৎসইভাবে পিনকে উঠা নামা করিয়ে সব সময় তল থেকে সঠিক দূরত্বে রাখে।

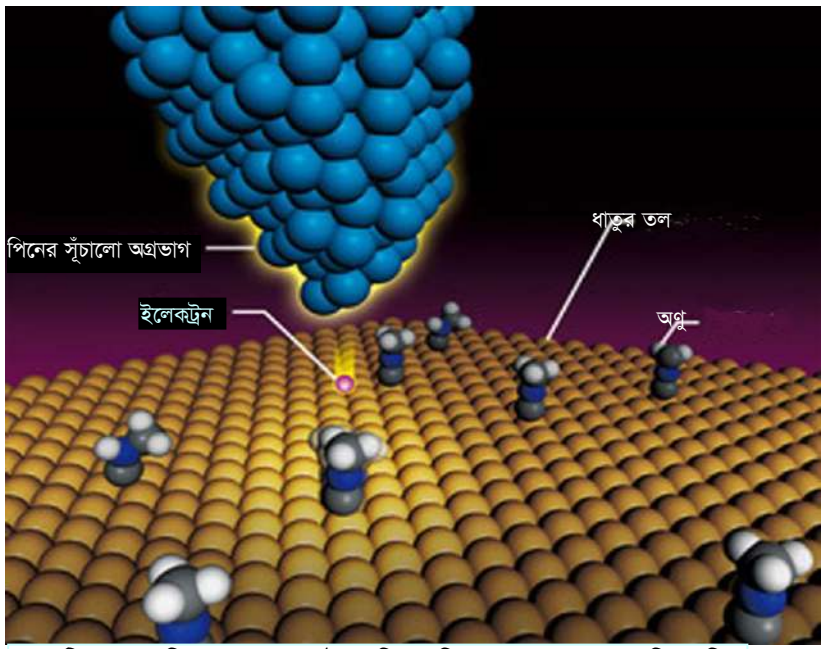

এস টি এম এর পিন ধাতব তলের উপর দিয়ে বুলিয়ে যাওয়া হচ্ছে (কাল্পনিক ছবি, পরমাণু-পর্যায়ের)

সঙ্গের কম্পিউটার ব্যবস্থা নিজে আবার টানেলিং কারেন্ট থেকে তথ্য নিয়েই সঠিক দূরত্বে রাখার এ কাজটি করে থাকে। একই সঙ্গে স্ক্যানার ব্যবস্থা পিনকে বুলিয়ে যেতে থাকে। ফলে শেষ পর্যন্ত কম্পিউটার পর্দায় যা দেখা যায় তা হলো টানেলিং কারেন্টের উঠানামার ভিত্তিতে পরমাণুর অবয়ব। কত সূক্ষ্ম ভাবে এটি পরমাণু গুলোকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে তা নির্ভর করে পিনের অগ্রভাগ কত বেশি সূঁচালো তার উপরেও। পিন যথেষ্ট সূঁচালো হলে এর অগ্রভাগের একেবারে সামনে পিনের যে পরমাণু থাকে সেটিই আসলে বুলিয়ে যাওয়ার কাজ করে এবং

সেখান থেকে টানেলিং কারেন্ট প্রবাহিত হয়। এরও আয়তন এক পরমাণুর সমান বলে তলের পরমাণুর অবয়বকে অনুসরণ করতে এর অসুবিধা হয়না।

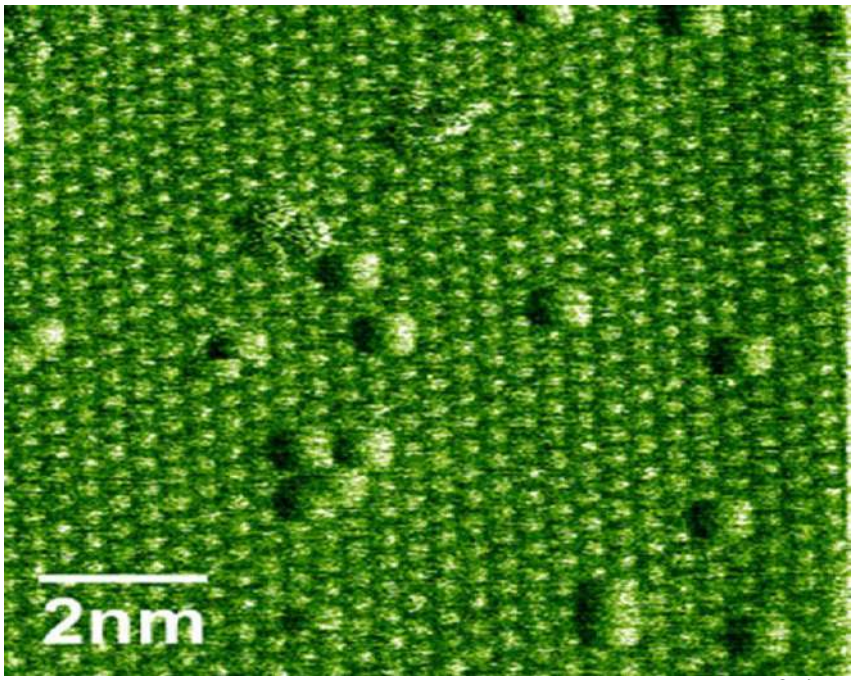

এসটিএম এর মাধ্যমে দেখা পরমাণুর সত্যিকার ছবি। বাম কোণার ২ ন্যানো মিটার দীর্ঘ রেখাটি বুঝিয়ে দিচ্ছে কত ক্ষুদ্র এই পরমাণু। (প্রায় ০.৫ ন্যানো মিটার)।

এভাবে গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস পরমাণুর প্রথম কল্পনা করার প্রায় আড়াই হাজার বছর পর আমরা সত্যি সত্যি দেখে নিশ্চিত হতে পারছি যে এটি নেহাৎ কল্পনা নয়, বা বিজ্ঞানীদের সৃষ্ট একটি তাত্ত্বিক আনুমানিক গঠন মাত্র নয়; এর খুবই বাস্তবিক অস্থিত্ব রয়েছে।

মজার ব্যাপার হলো এস টি এম শুধু পরমাণুকে দৃশ্যমানই করেনি, বরং একই রকম যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা এখন একটি একটি করে পরমাণুকে নিজ হাতে স্থানান্তরিত করতে পারছেন। একটি একটি করে পরমাণু নিয়ে গিয়ে এভাবে সাজিয়ে একটি কোম্পানীর লোগো পর্যন্ত তৈরি করতে পারছেন – একেবারে আক্ষরিক অর্থেই – পরমাণুর অক্ষরে। ন্যানো প্রযুক্তির আলোচনায় সিরিজের পরের বইয়ে আমরা এসবের বিস্তারিত দেখবো।

পরমাণু কেন্দ্র: নিউক্লিয়াস

নিউক্লিয়াস কী নিয়ে গঠিত

আমরা দেখেছি তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে কযেক রকমের রশ্মি নির্গত হয়– আলফা, বীটা এবং গামা রশ্মি। প্রথমটি আলফা কণিকা দিয়ে গঠিত, দ্বিতীয়টি বীটা কণিকা এবং তৃতীয়টি বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ (যাকেও কোয়ান্টাম দৃষ্টিতে কণিকা হিসেবে দেখা যায়) দিয়ে গড়া। এ সব যে একটানা বেরুচ্ছে তা কিন্তু নয়। বের হয় হঠাৎ হঠাৎ, এলোমেলো ভাবে এক ধরণের সম্ভাবনার নিয়মে– যেই সম্ভাবনার বিষয়টি কোয়ান্টাম তত্ত্বে আগাগোড়ায় জড়িয়ে রয়েছে। আলফা কণিকা হলো হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস অর্থাৎ ধনাত্মক ও তুলনামূলক ভাবে বড়। বীটা কণিকা হলো ইলেকট্রন, তাই ঋণাত্বক। পরে বুঝা গেছে আলফা, বীটা, গামা সবই আসলে আসছে পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে, নিউক্লিয়াসের বাইরে থেকে নয়। রাদারফোর্ডের সেই সোণার পাত আর আলফা কণিকার এক্সপেরিমেন্টে নিউক্লিয়াস বা পরমাণু কেন্দ্রের আবিষ্কার আমরা দেখেছি। দেখেছি এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে পরমাণুর প্রায় সব ভর এবং সব ধনাত্মক চার্জ। আলফা, বীটা, গামা কণিকা নির্গত হওয়ার ফলে নিউক্লিয়াসে পরিবর্তন ঘটছে, তার অবক্ষয় হচ্ছে – ফলে পরমাণুটিই বদলে যাচ্ছে। এক সময় আমরা যে অবিভাজ্য, অপরিবর্তনীয় পরমাণুর কথা মনে করতাম সেটি যে আর মোটেই রইলোনা তা বলাই বাহুল্য।

হাইড্রোজেন গ্যাস হলো সব চেয়ে হালকা মৌলিক পদার্থ, এর পরমাণুও হলো সব চাইতে কম ভরযুক্ত, কম চার্জ যুক্ত, সব চেয়ে সরল পরমাণু। হাইড্রোজেনের যে নিউক্লিয়াস সেটি আসলে একটি ধনাত্মক কণিকা যার নাম প্রোটন। হাইড্রোজেনের চেয়ে ভারী সব পরমাণুর নিউক্লিয়াসে এ রকম প্রোটন বিভিন্ন সংখ্যায় রয়েছে। একটি করে প্রোটন বেড়ে এর পরবর্তী বেশি চার্জের পরমাণুটি গঠিত হয়। যে সব মৌলের পরমাণুর অনেক ভর তার নিউক্লিয়াসে প্রোটন সংখ্যা অনেক বেশি - এভাবে স্থায়ী মৌলের মধ্যে সব চেয়ে ভারি পরমাণু ইউরোনিয়ামে প্রোটন সংখ্যা ৯২, প্রোটন আর ইলেকট্রনের সংখ্যা পরমাণুতে সমান বলে ইউরোনিয়ামে ইলেকট্রন সংখ্যাও ৯২।

প্রোটন বা ইলেকট্রনের সংখ্যাটিকে বলা হয় পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা। হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ১, ইউরোনিয়ামের ৯২, মাঝখানে এক একটি করে মৌলের ক্রমিক নম্বরের মত এই পারমাণবিক সংখ্যা অর্থাৎ প্রোটন-ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়ে। মৌলিক পদার্থ মাত্রেরই সুনির্দিষ্ট এই পারমাণবিক সংখ্যা, এই সংখ্যা রদবল হলে এটি ঐ মৌলিক পদার্থ আর থাকবেনা।

কিন্তু হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য সব পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা অনুযায়ী নিউক্লিয়াসের যা ভর হওয়া উচিত তার ভর কিন্তু তার চেয়ে বেশি হতে দেখা গেছে। কাজেই বুঝা গেছে যে নিউক্লিয়াসে প্রোটন ছাড়াও আরো অন্য রকমের কণিকা রয়েছে যার কোন চার্জ নেই। পরে ১৯৩২ সালে এই অন্য কণিকা নিউট্রন আবিষ্কৃত হয়েছে। দেখা গেছে এর ভর প্রোটন থেকে খুবই সামান্য বেশি। নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটনের সঙ্গে কিছু সংখ্যক নিউট্রন জড়াজড়ি করে থেকে নিউক্লিয়াস গঠিত। তেজস্ক্রিয় পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে ধনাত্মক আলফা কণিকা বের হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু নিউক্লিয়াসে ইলেকট্রন না থাকা সত্ত্বেও ঋণাত্মক বীটা কণিকা (ইলেকট্রন) এখানে আসলো কী করে? সেটি আমরা পরে বুঝতে পারবো।

এখানে বলে রাখি আলফা কণিকা হলো হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস– দুটি প্রোটন আর দুটি নিউট্রনে গড়া। সব প্রোটন আর নিউট্রনের মিলিত ভরকে বলা হয় পরমাণুর ভর সংখ্যা। সাধারণ হাইড্রোজেনের ভর সংখ্যা এক ধরে এটি

হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপের নিউক্লিয়াস

মোটামুটি হিসেব করা যায়। তবে সাধারণ হাইড্রোজেনের সঙ্গে যায় ব্যতিক্রমী হাইড্রোজেন পরমাণুও থাকে – অল্প সংখ্যায়। সাধারণ ও ব্যতিক্রমী সব প্রকারের নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা ১ বলে এগুলো সবই হাইড্রোজেন। কিন্তু সাধারণ হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসে নিউট্রন না থাকলেও ব্যতিক্রমী অন্য এক রকম হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে একটি নিউট্রনও থাকে। তাই এর পারমাণবিক সংখ্যা ১ হলেও সাধারণ হাইড্রোজেনের মত ভর সংখ্যা কিন্তু এর ১ নয়, বরং ২। এমন

'ভারী হাইড্রোজেনকে' বলা হয় ডিউটেরিয়াম। তার চেয়েও ভারি হাইড্রোজেন ট্রিটিয়ামের নিউক্লিয়াসে থাকে ২টি নিউট্রন। এর ভর সংখ্যা তাই ৩। এই তিন রকম হাইড্রোজেনকে বলা হয় হাইড্রোজেনের তিন রকমের আইসোটোপ। এরকম অনেক মৌলেরই একাধিক আইসোটোপ রয়েছে। অপেক্ষাকৃত ভারি পরমাণুর কোন কোন আইসোটোপের তেজস্ক্রিয়তার গুণও থাকে যেগুলোকে বলা হয় রেডিও আইসোটোপ। হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপকে লেখা হয়' ^{1}H, ^{2}H, ^{3}H এই চিহ্ন দিয়ে তার ভর সংখ্যা অনুযায়ী। বাকি মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপকে তার রাসায়নিক চিহ্নের উপর ভর সংখ্যা দিয়ে একই ভাবে লেখা হয়।

যদিও সাধারণ কার্বনের ভর সংখ্যা ১২, কার্বনের কিন্তু ^{8}C থেকে শুরু করে ^{22}C পর্যন্ত ১৫টি আইসোটোপ রয়েছে, এর মধ্যে শুধু ^{12}C এবং ^{13}C তেজস্ক্রিয় নয়। প্রাচিন সামগ্রীর বয়স নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে এর মধ্যে ^{14}C বেশ সুপরিচিত। **নিউক্লিয়াসের নিজের বন্ধন শক্তি**

পরমাণুর গঠনের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারছি তার কেন্দ্রে রয়েছে গোটা পরমাণুর তুলনায় অনেক ছোট নিউক্লিয়াস এর প্রায় সব ভর ও ধনাত্মক চার্জ নিয়ে। এর ব্যাস $১০^{-১৫}$ মিটারের মত, আর পুরো পরমাণুটির ব্যাস $১০^{-১০}$ মিটারের মত, নিউক্লিয়াসের তুলনায় এক লক্ষ গুণ বড়। এত দূর পর্যন্ত ধনাত্মক নিউক্লিয়াস ঋণাত্বক ইলেকট্রনের উপর আকর্ষণ বজায় রাখতে পারে বলেই পরমাণু একটি স্থায়ী সত্বা হিসেবে টিকে থাকে। এমনটি যে হতে পারে তার কারণ এ আকর্ষণ হলো বিদ্যুৎ-চৌম্বক বলের আকর্ষণ যা কিনা যথেষ্ট সবল, এবং তার চেয়েও বড় কথা হলো দূরত্বের সঙ্গে ব্যস্ত বর্গ নিয়মে কমতে থাকে বলে যথেষ্ট দূর পর্যন্ত এই আকর্ষণ বজায় থাকে (মহাকর্ষও এই একই নিয়ম মানে)।

গোটা পরমাণুর কথা ছেড়ে যদি এবার আমরা নিউক্লিয়াসের দিকে তাকাই সেখানে চার্জ যুক্ত কণিকা রয়েছে শুধু একই প্রকার– শুধু ধনাত্মক প্রোটন। এর সব প্রোটন চার্জবিহীন নিউট্রন সহ জড়াজড়ি করে আছে ছোট্ট ঐটুকু নিউক্লিয়াসের মধ্যে। এটি কী ভাবে সম্ভব? সবই ধনাত্মক চার্জের অধিকারী এত কাছাকাছি থাকা প্রোটনগুলো তো বৈদ্যুতিক বিকর্ষণে পরস্পরকে ঠেলে দিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার কথা। তেমনটি হয়না তার কারণ প্রোটনের সঙ্গে প্রোটনের, প্রোটনের সঙ্গে নিউট্রনের, এবং নিউট্রনের সঙ্গে নিউট্রনের রয়েছে একটি ভিন্ন রকমের আকর্ষণ বল যার নাম নিউক্লিয়ার বল, আরো সঠিক ভাবে নিউক্লিয়ার সবল বল। বিদ্যুৎ চৌম্বক বলের চেয়ে এটি অনেক গুণে বেশি জোরালো। এই

কারণে এটি বিদ্যুৎ-চৌম্বক বলের প্রোটন-প্রোটন বিকর্ষণকে অগ্রাহ্য করে নিউক্লিয়সের ভেতর সব কণিকাকে জোরালো বাঁধনে আটকে রাখতে পারে। এই বন্ধন এত জোরালো যে এটি ভাঙ্গতে বাইরে থেকে যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। আপেক্ষিক তত্ত্বের $E=mc^2$ সমীকরণ অনুযায়ী শক্তির একটি ভর রূপ রয়েছে। এই ক্ষেত্রে বন্ধন ভাঙ্গার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি এত বেশি যে তার ভর-রূপটি বেশ ধর্তব্যের মধ্যে। উদাহরণ স্বরূপ দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রনে গড়া আলফা কণিকার যে ভর, পৃথক পৃথক থাকা দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রনের প্রত্যেকটির ভর যোগ করলে তার চেয়ে সামান্য বেশি পাওয়া যাবে। বাড়তিটুকু হলো মোট ভরের এক শতাংশের $\frac{১}{৭০০}$ ভাগ, বা সামান্য হলেও একেবারে ফেলনা নয়। এই বাড়তি ভরটুকু বন্ধনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে যায় আলফা কণিকায়।

প্রত্যেকটি কণিকার আলাদা এই যে বাড়তি ভর এটিই বন্ধনে থাকলে ঘাটতি হতো বলে একে ভর ঘাটতি বলা হয়। আমরা পরে দেখবো খুব হালকা নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে এরা একত্র হয়ে বড় নিউক্লিয়াস গঠন করলে কণিকা প্রতি ভর ঘাটতি বাড়ে। আবার ভারি নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে তা ভেঙ্গে দুটি হয়ে গেলে সেই ভগ্নাংশগুলোতেও কণিকাপ্রতি ভর ঘাটতি বাড়ে।

নিউক্লিয়ার বলটি বেশ জোরালো বটে, কিন্তু তার অন্য একটি দিক রয়েছে– এটি কাজ করে খুবই অল্প দূরত্বে – নিউক্লিয়াসের আয়তনের সঙ্গে তুলনীয় দূরত্বে। আসলে এটি সব চেয়ে ভাল কাজ করে দূরত্ব যখন একটি প্রোটন বা নিউট্রনের ব্যাসের চেয়ে বেশি না হয় – অর্থাৎ যখন এরা একেবারে আঁটসাট পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকে তখন। এর চেয়ে দূরত্ব সামান্য বাড়লেই দূরত্বের সঙ্গে এর জোর অত্যন্ত বেশি হারে কমে যায়। উল্লেখিত অল্প দূরত্বের চেয়ে একটু বেশি দূরে গেলেই এর প্রভাব আশ্চর্যজনক ভাবে কমে যায়। বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল বা তারো চেয়ে দুর্বল মহাকর্ষ বল তুলনামূলকভাবে নিউক্লিয়ার বল থেকে অনেক কম জোরালো বটে, কিন্তু এরা বেশি দূর থেকেও যথেষ্ট কাজ করে।

নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া, নিউক্লিয়ার শক্তি

তেজষ্ক্রিয়তা

কোন কোন পদার্থের নিউক্লিয়াস যে অবক্ষয়ী প্রকৃতির, তার থেকে আলফা, বীটা নামের কণিকা আর গামা নামের শক্তি যে হঠাৎ হঠাৎ খামখেয়ালী ভাবে নির্গত হচ্ছে তা আমরা দেখেছি, আর এগুলোকে তেজষ্ক্রিয় (রেডিও একটিভ) পদার্থ হিসেবে চিনেছি । একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন ভরের বিভিন্ন আইসোটোপের মধ্যেও যে কোন কোনটি তেজষ্ক্রিয় হতে পারে তাও দেখেছি। এখন দেখা যাক ঐ কণিকা অথবা শক্তি নির্গমণের ব্যাপারটি কী ভাবে ঘাট।
তেজষ্ক্রিয়তাকে আসলে নিউক্লিয়াসের অবক্ষয় হিসেবে দেখা যায়– আলফা অবক্ষয়, বীটা অবক্ষয়, এবং গামা অবক্ষয় হিসেবে।

আলফা অবক্ষয়: আলফা অবক্ষয়ের যে বিক্রিয়া তাতে মূল নিউক্লিয়াসটি দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। এর একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস এবং বাদ বাকি অংশ নিয়ে অন্য একটি নিউক্লিয়াস। হিলিয়াম নিউক্লিয়াসটি বেরিয়ে আসে, যা কিনা একটি আলফা কণিকা (দুটি প্রোটন আর দুটি নিউট্রনে গড়া)। এর ফলে বাকি যে নিউক্লিয়াসটি থাকে তা আর মূল পদার্থটি থাকেনা, কারণ এর শুধু ভরই কমেনি পারমাণবিক সংখ্যাও কমেছে প্রোটন হারাবার ফলে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা কৃত্রিম ভাবে সৃষ্ট ক্ষণস্থায়ী নেপচুনিয়াম নামক মৌলিক পদার্থে আলফা অবক্ষয়টির বিক্রিয়ার সমীকরণটি দেখতে পারি।

$$^{237}_{93}\mathrm{Np} \rightarrow {}^{233}_{91}\mathrm{Pa} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$$

নেপচুনিয়াম প্রোটেকটিরিয়াম হিলিয়াম (আলফা কণিকা)

আমরা আইসোটোপের চিহ্ন দেখার সময় বামে উপরে এর ভর সংখ্যা লেখার রীতিটি দেখেছিলাম। একইভাবে বামে নিচে পারমাণবিক সংখ্যাও লেখা হয়। বিক্রিয়ায় দেখতে পাচ্ছি নেপচুনিয়াম বেশ ভারি একটি নিউক্লিয়াস আর ভর সংখ্যা ২৩৭, আর এর পারমাণবিক সংখ্যা ৯৩, যাকে প্রাকৃতিক ভাবে পাওয়া ইউরোনিয়াম থেকে কৃত্রিম ভাবে সৃষ্টি করা যায়। তেজষ্ক্রিয় হওয়াতে এর আলফা অবক্ষয়ে একটি আলফা কণিকা অর্থাৎ হিলিয়াম নিউক্লিয়াস বের হয়ে যায়, এতে বাকি থাকে অন্য একটি মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস প্রোটেকটিরিয়াম, যার পারমাণবিক সংখ্যা ৯১ এবং ভর সংখ্যা ২৩৩। দুটি প্রোটন চলে যাওয়াতে

পারমাণবিক সংখ্যা ৯৩ থেকে ৯১ হয়েছে, এবং দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন মোট চারটি কমে যাওয়াতে ভর সংখ্যা ২৩৭ থেকে কমে ২৩৩ হয়েছে। এরকম আলফা অবক্ষয় সাধারণত ভারি পরমাণুর ক্ষেত্রেই সচরাচর দেখা যায় যাদের ভর সংখ্যা ৮২ এর উপরে। এই যে নিউক্লিয়াস থেকে বেশ খানিকটা ভর ও চার্জ নিয়ে আলফা কণিকা র বেরিয়ে যাওয়া, এটি কিন্তু স্বাভাবিক একটি ঘটনা নয় যাকে নিউটনীয় চিরায়ত গতি বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। কারণ একে বের হতে হয় নিউক্লিয়াসের যেমন শক্তি-বাধা অতিক্রম করে সে রকম শক্তি আলফা কণিকার থাকার কথা নয়। বের হওয়াটি সম্ভব হয় কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার অনিশ্চয়তার নীতির কারণে। আমরা সিরিজের আগের বইয়ে দেখেছি এমন অসম্ভব বাধা অতিক্রম করে বাইরে চলে আসার কিছু সম্ভাবনা কীভাবে কণিকা লাভ করে – শক্তি ও তার প্রযুক্ত হবার সময়ের মধ্যে একটি নিশ্চিত হলে অন্যটি অনিশ্চিত হয়ে যাবার সুযোগ নিয়ে।

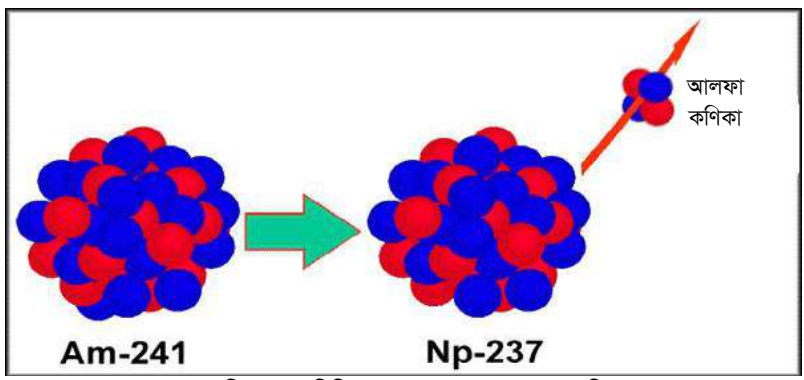

তেজস্ক্রিয় আমেরিশিয়াম-২৪১ থেকে আলফা কণিকা নির্গত হয়ে তা নেপচুনিয়াম-২৩৭ এ পরিণত হচ্ছে

বীটা অবক্ষয়: বীটা অবক্ষয়ের বিষয়টি আরেকটু জটিল। এখানে আমাদেরকে আরো কিছু নূতন ধারণার অবতারণা করতে হবে। যেমন এখানে বিক্রিয়ায় একটি নূতন ধরনের বল জড়িত হয়ে পড়ে – যাকে বলা হয় নিউক্লিয়ার দুর্বল বল। এটি নিউক্লিয়ার সবল বল – যা প্রোটন ও নিউট্রনগুলোকে একত্র রাখে– তার চেয়ে দুর্বল। তাছাড়া এতক্ষণ প্রোটন আর নিউট্রনকে যে আমরা পরস্পর স্বাধীন প্রায় সমান ভরের কণিকা হিসেবে দেখেছি তাও একটু খুলে বলতে হবে। নিউট্রন আসলে প্রোটনের চেয়ে খুব সামান্য একটু ভারি– কারণ একে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনের সমষ্টি বলে কল্পনা করা যায় যে কারণে এর মোট

চার্জ শূন্য। বীটা অবক্ষয়ে একটি নিউট্রন অবক্ষয়িত হয়ে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনে পরিণত হয়, এবং ঐ ইলেকট্রনটি বীটা কণিকা রূপে বেরিয়ে আসে। আরো একটি অদ্ভূত কণিকা এর সঙ্গে বেরিয়ে আসে যাকে বলা হয় নিউট্রিনো। এই নিউট্রিনো কণিকাটি যেন একটি ভুতূড়ে কণিকা যার ভর বলতে এত সামান্য যে প্রথম দিকে একে উদ্ঘাটন করাই দু:সাধ্য ছিল; যদিও এখন অত্যন্ত জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাকে উদ্ঘাটনের ব্যবস্থা হয়েছে। যে কোন বস্তুর ভেতর দিয়ে বিন্দু মাত্র শোষিত না হয়ে এটি শত শত কিলোমিটার চলে যেতে পারে - যেমন মাটির ভেতর দিয়ে। সে যাই হোক এও বীটা অবক্ষয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানে নিউট্রনের অবক্ষয়টি আমরা এভাবে লিখতে পারি:

$$\underset{\text{নিউট্রন}}{{}^{1}_{0}\mathrm{n}} \rightarrow \underset{\text{প্রোটন}}{{}^{1}_{1}\mathrm{H}} + \underset{\text{ইলেকট্রন}}{{}^{0}_{-1}\mathrm{e}} + \underset{\text{নিউট্রিনো}}{{}^{0}_{0}\upsilon}$$

প্রোটন আর হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস অভিন্ন জিনিস বলেই একে ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$ লেখা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কার্বনের একটি আইসেটোপ ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ তেজস্ক্রিয় পদার্থ যার বীটা অবক্ষয় রয়েছে। এই আইসোটোপকে আমরা বলবো কার্বন -১৪।

$$\underset{\text{কার্বন}}{{}^{14}_{6}\mathrm{C}} \rightarrow \underset{\text{নাইট্রোজেন}}{{}^{14}_{7}\mathrm{N}} + \underset{\substack{\text{ইলেকট্রন}\\(\text{বীটা কণিকা})}}{{}^{0}_{-}\mathrm{e}} + \underset{\text{নিউট্রিনো}}{{}^{0}_{0}\upsilon}$$

এখানে একটি নিউট্রন প্রোটনে পরিণত হয়ে বলে নিউক্লিয়াসটির ভর একই বয়ে গেছে, কিন্তু প্রোটনের সংখ্যা একটি বাড়াতে এর পারমাণবিক সংখ্যা বেড়ে কার্বন নিউক্লিয়াসটি এখন নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়েছে।

গামা অবক্ষয়: আলফা অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের ভর সংখ্যা এবং পারমাণবিক সংখ্যা উভয়েই পরিবর্তিত হয়, বীটা অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে শুধু পারমাণবিক সংখ্যা পরিবর্তিত হয় (ভিন্ন পদার্থে পরিণত হয়), কিন্তু গামা অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে কোনটাই পরিবর্তিত হয়না (একই পদার্থ থাকে)। এক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস শুধু শক্তি হারায়– বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ গামা রশ্মি হিসেবে। অবশ্য একে শক্তির কণিকা হিসেবে গামা কণিকা রূপেও দেখা যায়।

কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা অনুযায়ী ইলেকট্রনের যে রকম বিভিন্ন বৈধ শক্তি-অবস্থা থাকে তেমনি নিউক্লিয়াসের ভেতর প্রোটন ও নিউট্রনেরও সে রকম বিভিন্ন শক্তি-

অবস্থা থাকে। ইলেকট্রনের মত এগুলোও উত্তেজিত হয়ে উচ্চতর শক্তি অবস্থায় চলে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে এরাও কিছু শক্তি গামা বিকিরণ হিসেবে ত্যাগ করে পূর্ব স্বাভাবিক শক্তি অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ এরকম উত্তেজিত একটি সীসা-২০৪ এর নিউট্রিয়াসে গামা অবক্ষয়ের বিক্রিয়া দেখা যাক:

$$^{204}_{82}Pb^{*} \rightarrow {}^{204}_{82}Pb + \gamma$$

সীসা সীসা গামা বিকিরণ

তারকা চিহ্ন দিয়ে উত্তেজিত অবস্থা বুঝানো হয়েছে।

তেজস্ক্রিয়তা দিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রাচীনত্ব নির্ধারণ: কার্বন ডেইটিং

এক একটি আলফা বীটা, বা গামা কণিকা খামখেয়ালী ভাবে ইতস্তত বের হলেও প্রত্যেক তেজস্ক্রিয় পদার্থ মোটের উপর কী হারে অবক্ষয়িত হবে তা কিন্তু সুনির্দিষ্ট। এই হারটি প্রকাশ করা হয় মূল তেজস্ক্রিয় পদার্থটির ভর অর্ধেক হতে কত সময় লাগে সেই হিসাবে। যেমন ধরা যাক শুরুতে ষ্ট্রনশিয়াম-৯০ এই তেজস্ক্রিয় পদার্থটির ১০০ মাইক্রোগ্রাম আমরা কোন স্যাম্পলের মধ্যে পরিমাপ করলাম। বীটা অবক্ষয়ের মাধ্যমে এক একটি ষ্ট্রনশিয়াম-৯০ নিউক্লিয়াস ইট্রিয়াম-৯০ নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়, ফলে ষ্ট্রনশিয়ামের পরিমাণ কিছু কমে যায়। দেখা যায় এভাবে অবক্ষয়িত হতে হতে ২৮ বছরে ১০০ মাইক্রোগ্রাম ষ্ট্রনশিয়াম অর্ধেকে অর্থাৎ ৫০ মাইক্রোগ্রামে পরিণত হয়। আরো ২৮ বছরে এটি আবার অর্ধেক হয়ে ২৫ মাইক্রোগ্রামে, এবং আরো ২৮ বছরে ১২.৫ মাইক্রোগ্রামে পরিণত হয়– এ ভাবে চলতেই থাকে। অবক্ষয়ের যে নিয়ম তার ফলেই একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর তেজস্ক্রিয় পদার্থের এর অর্ধেক হয়ে যায়, সেই সময়কে বলা হয় অর্ধ-জীবন (হাফ লাইফ)। আমরা দেখলাম ষ্ট্রনশিয়াম-৯০ এর অর্ধজীবন ২৮ বছর। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষেত্রে এই অর্ধজীবন এক সেকেন্ডের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ থেকে শুরু করে বহু কোটি বছর পর্যন্ত হতে পারে। আর এটিই প্রাচিন নিদর্শনের বয়স নির্ণয়ের একটি সুযোগ এনে দিয়েছে।

অতীতের কোন সময়ের বা তখনকার কোন ঘটনার কালের কোন বস্তুর মধ্যে সংমিশ্রিত নানা পদার্থের পরিমাণ যদি আমাদের জানা থাকে এবং তার মধ্যে একটি পদার্থ যদি তেজস্ক্রিয় হয় যার অর্ধজীবন ঐ প্রাচীনত্বের তুলনায় সুবিধাজনক হয়, তা হলে বয়স নির্ণয়ের এই সুযোগ সৃষ্টি হয়। বস্তুটিতে নানা

পদার্থের মিশ্রণে তেজস্ক্রিয় পদার্থটির আজকের অনুপাত থেকে আমরা জানতে পারব তাতে তেজস্ক্রিয় পদার্থটির কতটি অর্ধজীবন পার হয়েছে– অর্থাৎ কত বছর আগে ঐ ঘটনাটি ঘটেছিল।

কার্বনের একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কার্বন-১৪ ব্যবহার করে পুরাতাত্ত্বিক অনেক নিদর্শনের বয়স নির্ণয়ের কাজটি খুব বেশি ব্যবহৃত হয় – যাকে বলা হয় কার্বন ডেটিং। এই বয়স শুধু সেই নিদর্শনের ক্ষেত্রে করা যায় যার মধ্যে প্রাচিন কোন উদ্ভিজ্জের ফসিল বা ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। উদ্ভিদের অধিকাংশই কার্বন; যখন বেঁচে থাকে তখন মহাশূন্য থেকে আসা কসমিক রে'র প্রভাবে উদ্ভিদের দেহে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সাধারণ কার্বনের সঙ্গে কিছু কার্বন-১৪ এসে জমে, যা বাতাসের নাইট্রোজনের সঙ্গে কসমিক রে'র নিউট্রনের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়, এবং বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইডের অংশ হিসেবে উদ্ভিদ দেহে আসে। দেখা গেছে যে জীবদ্দশায় উদ্ভিদের মোট কার্বনের মধ্যে কার্বন-১৪ এর পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে সব সময় সমান থাকে নূতন ভাবে কার্বন-১৪ সব সময় আসছে বলে। কিন্তু যে মুহূর্তে উদ্ভিদ মরে যায়, সালোক সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে নূতন কার্বন-১৪ আসার আর সুযোগ থাকেনা। এরপর থেকে বীটা অবক্ষয়ের মাধ্যমে কার্বন-১৪ এর পরিমাণ ক্রমে কমতে থাকে, এবং অবক্ষয়ের হারটি কার্বন-১৪ এর অর্ধজীবনের উপর নির্ভর করবে। যেহেতু কার্বন-১৪ এর অর্ধ জীবন ৫,৭৩০ বছর, কাজেই এত বছর পর পর অর্ধেক হওয়া কার্বন-১৪ এর বর্তমান পরিমাণে উপনীত হতে কতবার অর্ধেক হতে হয়েছে সেই হিসাব থেকে প্রাচিন বস্তুটির বয়স নির্ণয় করা যায়। এভাবে বয়স নির্ণীত হতে পারে সুদূর অতীতের কাঠের নির্মিত কোন আসবাবে, কোন খাদ্য বস্তু, শস্য, উদ্ভিদের ফসিল ইত্যাদিতে। অবশ্য কার্বন ডেইটিং এর ক্ষেত্রে ৪০ হাজার বছরের বেশি প্রাচিন কোন নিদর্শনের বয়স নির্ভুল ভাবে নির্ণয় করা যায় না।

তবে তেজস্ক্রিয় অন্যান্য নানা পদার্থ যাদের অর্ধজীবন আরো অনেক দীর্ঘ এবং যাদের আদি পরিমাণ নির্ণয়ের অন্য ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলোর অবক্ষয় দেখে আরো অনেক বেশি প্রাচিন জিনিসের বয়স নির্ণয় করা যায় – যেমন বিভিন্ন ধরনের শিলার বয়স, এবং সেই শিলার স্তরে যে ফসিল রয়েছে সেই সুবাদে তার বয়স অর্থাৎ প্রাচিন জীবের বয়স। এমনি করেই আমরা আদিতম শিলা থেকে পৃথিবীর নিজের বয়স সম্বন্ধেও নিশ্চিত হয়েছি– তাও কোন কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের খুবই দীর্ঘ অর্ধজীবনের হিসাবে।

বয়স নির্ণয় করা ছাড়াও তেজস্ক্রিয়তার আরো অনেক ব্যবহার রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নিয়ন্ত্রিত তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলো প্রয়োগে রোগাক্রান্ত কোষ ধ্বংস করে ক্যানসারসহ নানা চিকিৎসা (রেডিও থেরাপি), নিরাপদ সীমার তেজস্ক্রিয় পদার্থ শরীরে ঢুকিয়ে ও তা বাইরে থেকে অনুসরণ করে শরীরের অভ্যন্তরে নানা ক্রিয়াকে অবলোকন করতে, পচনকারী জীবাণু ধ্বংস করে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করতে, কোন গ্যাসবাহী নলে ক্ষুদ্র লীক বের করতে, ইত্যাদি। তবে মনে রাখতে হবে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি তেজস্ক্রিয়তা শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর– এর থেকে নিঃসৃত রশ্মিগুলো অধিক মাত্রায় বা অধিক সময়ের জন্য শরীরের এসে পড়লে কোষ ধ্বংস হয়, ক্যানসার সৃষ্টি হয়, এমনকি অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

এক মৌলিক পদার্থকে অন্য মৌলিক পদার্থে পরিণত করা

যে পদার্থগুলোকে বিশ্লেষণ করলে ঐ পদার্থ ছাড়া অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায়না সেগুলোই মৌলিক পদার্থ বা মৌল। সেগুলোকে আবিষ্কার করতে বিজ্ঞানীরা প্রাচিন কাল থেকে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। আলকেমিষ্ট বলে পরিচিত আদি রসায়নবিদরা মনে করতেন কোন মৌলকে রাসায়নিকভাবে পরিবর্তন করে অন্য মৌলতে পরিবর্তন করা সম্ভব – বিশেষ করে কম দামী ধাতুকে সোনাতে পরিণত করতে প্রচুর চেষ্টা তাঁরা চালিয়েছেন। তাঁদের সে চেষ্টা কখনোই সফল হয়নি। বরং আধুনিকতর রসায়নবিদ্যার একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় ছিল যে মৌল অপরিবর্তনীয়। কখনো এক মৌলকে অন্যটিতে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

কিন্তু নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া আবিষ্কারের পর আমরা দেখেছি যে এটি শুধু সম্ভবই নয় তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়ের ফলে প্রকৃতিতে এটি অহরহ ঘটছে, উপরের আলোচনায় যার কিছুটা এসেছে। শুধু তাই নয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছাড়া অন্য পদার্থেও কৃত্রিম ভাবে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া ঘটিয়ে এ কাজ আমরা ল্যাবরেটরিতে করতে পারি। প্রথম এটি করেছিলেন রাদারফোর্ড যিনি নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি নাইট্রোজেন-১৪কে আলফা রশ্মির সামনে মেলে ধরে এর থেকে অক্সিজেন-১৭ তৈরি করেছিলেন। এর বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

$$^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{4}_{2}\mathrm{H_e} \rightarrow {}^{17}_{8}\mathrm{O} + {}^{1}_{1}\mathrm{H}$$

নাইট্রোজেন — আলফা কণিকা (হিলিয়াম নিউক্লিয়াস) — অক্সিজেন — প্রোটন (হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস)

নিউক্লিয়াসের আবিষ্কার এবং ল্যাবোরেটরিতে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া সৃষ্টি এভাবে যেন প্রাচিন আলকেমিষ্টদের স্বপ্নের আধুনিক বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিয়েছে। এভাবে পারদ থেকে সোনা তৈরির সুযোগও আছে, কিন্তু তাতে প্রাচিন আলকেমিষ্টদের আসল উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে বলা যাবেনা, কারণ যেটুকু সোনা এভাবে তৈরি হবে, তৈরি করার ব্যয় পড়বে তার দামের চেয়ে অনেক অনেক বেশি।

অবমুক্ত নিউক্লিয়ার শক্তির উৎস

যে নিউক্লিয়ার সবল বলের মাধ্যমে নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রনগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে এত অল্প জায়গায় থাকে বিশেষ কিছু বিক্রিয়ায় এই শক্তির কিছুটা বেরিয়ে আসা সম্ভব। একটি নিউক্লিয়াস থেকে বের হওয়া এরকম শক্তি সামান্য হলেও যদি দ্রুত এরকম অসংখ্য নিউক্লিয়াসের শক্তি বেরিয়ে আসে তা হলে তা প্রচণ্ড রূপ পেতে পারে।

একটি নিউক্লিয়াসের ভেতর দুটি প্রোটন-নিউট্রনকে (উভয়কে আমরা এখন শুধু কণিকা বলবো) বন্ধনে রাখতে যে শক্তি নিয়োজিত থাকে তার সমমানের ভরকে নাম দিই B। শক্তি আর ভরকে যে আমরা একই ভাবে দেখতে পারি তা আপেক্ষিক তত্ত্বে $E=mc^2$ থেকে জানা রয়েছে। ২টি কণিকায় নিউক্লিয়াস গড়া হলে দুই কণিকার বন্ধনের জন্য ভর ব্যবহৃত হয়ে যাবে B। তাই প্রতি কণিকার জন্য ভর ঘাটতি হবে $B/2$। যদি ৩টি কণিকায় নিউক্লিয়াস গঠিত হয় তা হলে বিভিন্ন জোড়ার জোড়ায় থাকে ৩টি বন্ধন। মোট ভর ঘাটতি হবে $3B$। সে ক্ষেত্রে প্রতি কণিকার জন্য ভর ঘাটতি হবে $\frac{3B}{3}$ অর্থাৎ B। দেখা গেল নিউক্লিয়াসে কণিকা সংখ্যা একটি বাড়াতে কণিকা প্রতি ভর ঘাটতি বেড়ে গেল। যদি ৪টি কণিকায় নিউক্লিয়াস গঠিত হয় তাহলে এতে জোড়ায় জোড়ায় বন্ধন থাকে ৬টি, তাই মোট ভর ঘাটতি $6B$। সে ক্ষেত্রে কণিকা প্রতি ভর ঘাটতি হবে $\frac{6B}{4}$ অর্থাৎ $\frac{3B}{2}$। কণিকা সংখ্যা আরো এক বাড়াতে, অর্থাৎ নিউক্লিয়াস আরো একটু ভারি হওয়াতে কণিকা প্রতি ভর ঘাটতি আরো বাড়লো; এভাবে আরো ভারি হলে সেটি আরো বাড়ার কথা। কিন্তু এ প্রক্রিয়া শিগ্‌গির বন্ধ হয়ে যাবে নিউক্লিয়াসের ভর অল্প কিছুটা বাড়ার পরই। তারপর কিন্তু নিউক্লিয়াস আরো ভারি হবার সঙ্গে সঙ্গে কণিকা প্রতি বন্ধনশক্তি আর বাড়েনা, বরং কমতে থাকে।

এর কারণটি অন্য রকম। ৪টি পর্যন্ত কণিকার ক্ষেত্রে ঠাসাঠাসি করে কণিকা থাকলে তাদের প্রত্যেকটি অন্যটিকে স্পর্শ করতে পারে। গোলকাকার যে কোন কিছুর জন্য যে কথাটি সত্য তা ৪টি কমলা লেবু ঠাসাঠাসি করে রাখলেই বুঝা যাবে। কিন্তু ৫টির ক্ষেত্রে এমনটি হবেনা– ৫টির প্রত্যেকটি একে অন্যকে স্পর্শ করতে পারবেনা। সেক্ষেত্রে পঞ্চমটি অপেক্ষাকৃত দূরে থাকবে বলে বন্ধন শক্তি বা ভর ঘাটতি কিছু কমে যাবে। মনে রাখতে হবে যে নিউক্লিয়ার বল একটি প্রোটন বা নিউট্রনের ব্যাসের চেয়ে কম দূরত্বেই শুধু ভাল ধর্তব্যে আসবে, একটু দূরত্ব বাড়লেই দ্রুত কমে প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে যাবে। কাজেই স্পর্শ করছেনা এমন দুটি কণিকার ক্ষেত্রে এই বলকে তুচ্ছ করা যায়। এর ফলে ৫ বা তার অধিক কণিকার ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস যত ভারি বা বড় হবে ততই এরকম বেশি বেশি কণিকা-জোড়ার জন্য ভর ঘাটতি ধর্তব্যে আসবেনা। ফলে কণিকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কণিকাপ্রতি ভর ঘাটতি যে ভাবে বাড়ছিল সে ভাবে বাড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

শুধু তাই নয়, কণিকা সংখ্যা আরো বাড়লে এবার বরং কণিকাপ্রতি ভর ঘাটতি উল্টো কমতে থাকবে। তুলনামূলক ভাবে বেশ বড় একটি নিউক্লিয়াসের ঠিক কেন্দ্রের একটি কণিকার কথা যদি ভাবি তাহলে সব চেয়ে আঁটসাট ভাবে প্যাক করলেও ঐ কণিকার চারিদিকে ১২টির বেশি নিকটতম পড়শি কণিকা থাকতে পারবেনা। আবার অনেকগুলো কমলার প্যাকিং করে ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের কণিকাটির সঙ্গে ১২টি পড়শি কণিকার প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কণিকা ও পড়শি কণিকার মধ্যে B পরিমাণ ভর ঘাটতি দু'ভাগ হবে। তাই প্রত্যেক বন্ধনের জন্য কেন্দ্রীয় কণিকাটির ভর ঘাটতি $\frac{B}{2}$, এভাবে ১২টি বন্ধন থেকে কেন্দ্রীয় কণিকাটির মোট ভর ঘাটতি হবে $\frac{B}{2}\times 12 = 6B$। তাই অন্য কোন ব্যাঘাত না হলেও সব চেয়ে বেশি কণিকাপ্রতি ভর ঘাটতি এক্ষেত্রে হতে পারতো তা হলো $6B$, সে নিউক্লিয়াসটি যত বড় ও ভারি হোক না কেন। এর কারণ নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রের কণিকা বা কেন্দ্রের কাছাকাছি কণিকার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১২টি নিকটতম পড়শি কণিকা হতে পারলেও নিউক্লিয়াসের যত কিনারার দিক যাব তা আরো কম হবে। আসলে এইটুকুও পুরোপুরি হবেনা, কারণ কেন্দ্রীয় কণিকাটিতে ১২টি অন্য কণিকা নিউক্লিয়ার বলে জোরালো আকর্ষণ করছে বটে, কিন্তু এরকম কণিকার মধ্যে যেগুলো প্রোটন, সেগুলোকে নিউক্লিয়াসের বাকি সব প্রোটন বিদ্যুৎ চৌম্বক বলে বিকর্ষণও করে। এই বলটি

অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও যেহেতু নিউক্লিয়ার বলের মত এটি দূরত্বের সঙ্গে দ্রুত কমে যায়না কাজেই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ কণিকাপ্রতি ভর ঘাটতি 6Bও হবেনা, তার চেয়ে কম হবে। নিউক্লিয়াস আরো যত বড় হতে থাকবে তাতে প্রোটনের সংখ্যা তত বাড়বে কাজেই বিকর্ষণের ভাগও বাড়তে থাকবে। ফলে কণিকা প্রতি সর্বোচ্চ ভর ঘাটতিতে পৌছার পর নিউক্লিয়াস যত বড় হবে এবার কণিকাপ্রতি ভর ঘাটতি বরং কমতে শুরু করবে।

এই পুরো বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে নিউক্লিয়াসে কণিকা সংখ্যার বিপরীতে কণিকাপ্রতি ভর ঘাটতির অর্থাৎ বন্ধন শক্তির একটি গ্রাফ যদি আমরা আঁকি তা হলে সব চেয়ে কম কণিকার নিউক্লিয়াসে এই ভর ঘাটতি সব চেয়ে কম হবে, তারপর কণিকা সংখ্যা যত বাড়বে (নিউক্লিয়াস যত বড় ও ভারি হবে) ভর ঘাটতি তত বাড়বে কিন্তু 6B এর চেয়ে কম একটি মাত্রায় পৌঁছে এটি আর বাড়বে না। এরপর কণিকা সংখ্যা আরো বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভর ঘাটতি ক্রমেই কমতে থাকবে। এরকম বাস্তবিক যে গ্রাফ পরীক্ষণে পাওয়া যায় তা চিত্রে দেখা যাচ্ছে। অবশ্য অন্যান্য নানা কারণে বিষয়টি এর চেয়ে জটিলতর এবং গ্রাফটিও উপরের সরল বর্ণনার থেকে কিছুটা জটিলতর।

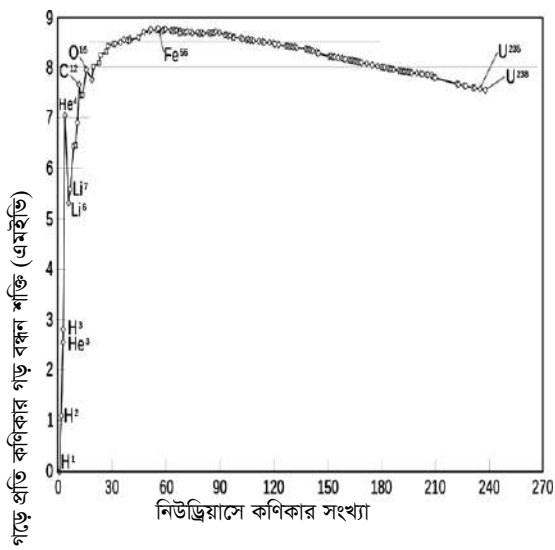

হালকা নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের কণিকা সংখ্যা বাড়লে কণিকা প্রতি বন্ধনশক্তি বাড়ে, আবার ভারি কণিকার ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের কণিকা সংখ্যা বাড়লে কণিকা প্রতি বন্ধন শক্তি আবার কমে

যে দুই রকম নিউক্লিয়ার শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মূলে এই গ্রাফটির ভুমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমরা ভর ঘাটতির এমন আচরণের কিছুটা সরলীকৃত কারণগুলো এত সবিস্তারে তুলে ধরলাম। আমরা দেখবো এর ফলে খুব ভারি নিউক্লিয়াসকে ভেঙ্গে দু'ভাগ করলে অথবা খুব হালকা নিউক্লিয়াস দুটি যোগ করে একটি করলে উভয় ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার শক্তির অবমুক্তি ঘটতে পারে।

নিউক্লিয়ার ফিশন শক্তি

১৯৩০ এর দশকে আবিষ্কৃত হয়েছিল যে স্বল্পগতির নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে কোন কোন খুব ভারি পরমাণুর বিশেষ বিশেষ আইসোটোপের নিউক্লয়াস অদ্ভূত কিছু আচরণ করে। এটি নিউট্রনটিকে শোষণ করে যথেষ্ট উত্তেজিত ও অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে এবং ফলশ্রুতিতে দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট অংশে ভাগ হয়ে যায়, একই সঙ্গে কিছু নিউট্রন এবং শক্তি নির্গত হয়। নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে যায় বলে এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ফিশন (ছেদ) বিক্রিয়া। যে আইসোটোপগুলোর ক্ষেত্রে এমনটি হয় তাকে বলা হয় ফিশন- যোগ্য পদার্থ। ইউরেনিয়াম-২৩৫ এরকম একটি ফিশনযোগ্য আইসোটোপ। এর ফিশন বিক্রিয়া পর পর নিম্নরূপ:

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{23}_{92}\mathrm{U}$$

ইউরেনিয়াম নিউট্রন ইউরেনিয়াম

$^{236}_{92}\mathrm{U} \rightarrow$ দুটি অপেক্ষাকৃত হালকা নিউক্লিয়াস + নির্গত নিউট্রন+ নির্গত শক্তি

শক্তি নির্গত হবার কারণটি এখানে ঐ গ্রাফটিতে থেকে স্পষ্ট। ভারি নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে যখন দু'ভাগ হয়ে দুটি অপেক্ষাকৃত হালকা নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয় তখন এগুলোর প্রত্যেকটিতে কণিকাপ্রতি ভর ঘাটতি বেশি। কাজেই মূল নিউক্লিয়াসে যে মোট ভর ঘাটতি ছিল এ দুটি ভগ্নাংশের মোট ভর ঘাটতি তার চেয়ে বেশি হবে। বাড়তি ভর ঘাটতি টুকু শক্তিরূপে অবমুক্ত হবে। একটি নিউক্লিয়াসের ফিশনে সৃষ্ট এরকম শক্তি খুব বেশি নয়। কিন্তু ফিশন একবার একটিতে শুরু হলে এর ফলে এক ধরনের চেইন রিয়্যাকশনের সূত্রপাত হবার সুযোগ থাকে। প্রথম ফিশন থেকে নির্গত নিউট্রনের আঘাতে কাছাকাছি আরো নিউক্লিয়াসে ফিশন ঘটে। একটি ফিশন থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি এমনিভাবে বিক্রিয়াটি ছড়িয়ে পড়ার চেইন রিয়্যাকশন সৃষ্টি হলে বিপুল পরিমাণ ফিশন শক্তি বেরিয়ে আসতে পারবে। একটি ন্যূনতম পরিমাণ ফিশনযোগ্য পদার্থ একসঙ্গে থাকলে এই ব্যাপারটি ঘটতে পারবে। এই ন্যূনতম ভরকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল ম্যাস।

অবশ্য আরো ফিশন ঘটিয়ে চেইন রিয়্যাকশন সম্ভব করার জন্য বের হয়ে আসা নিউট্রনগুলোকে বেগ কমিয়ে মন্থর করতে হয়।

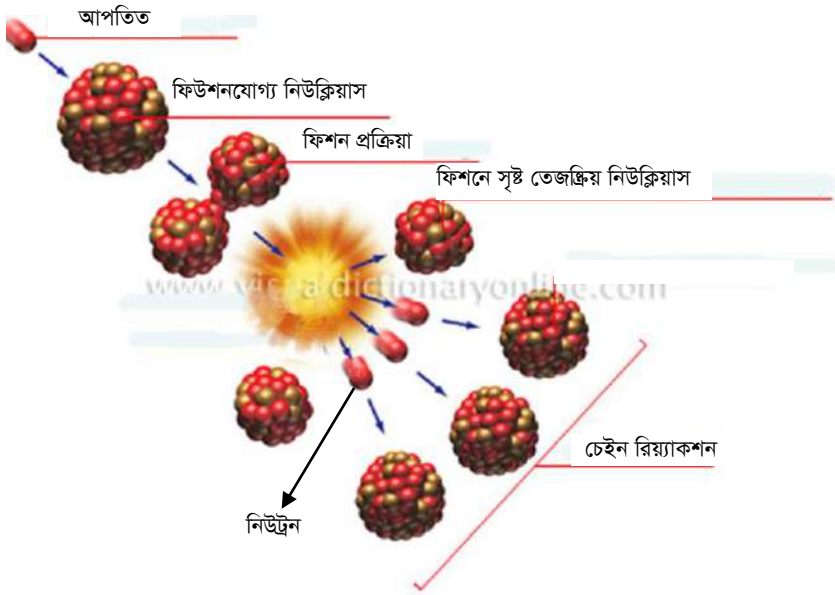

নিউক্লিয়ার ফিশন

তাত্ত্বিক ভাবে এই ফিশন নিউক্লিয়ার শক্তির বিষয়টি কিছু আগেই আবিষ্কৃত হলেও ক্রিটিক্যাল ম্যাস অর্জন করে, চেইন রিয়্যাকশনের মাধ্যমে প্রথম নিয়ন্ত্রিত ভাবে এই শক্তির বাস্তব রূপায়ন ঘটেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে ১৯৪২ সালে আমেরিকার একটি গোপন প্রজেক্টে। সেটিই ছিল প্রথম নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর। এ ধরণের বাস্তবায়নে কী কী প্রয়োজন হবে তার কিছুটা ইঙ্গিত আমরা ইতোমধ্যে পেয়েছি। জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হতে হয়েছে ইউরেনিয়াম-২৩৫ যা কিন্তু স্বাভাবিক ইউরেনিয়ামের অতি সামান্য অংশ। প্রাকৃতিক ভাবে প্রাপ্ত ইউরেনিয়ামের অধিকাংশটাই হলো ইউরেনিয়াম-২৩৮। সামান্য পরিমাণে থাকা ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর থেকে পৃথক করা একটি অত্যন্ত দুরূহ কাজ। দ্বিতীয়ত যা দরকার নিউট্রনের গতিকে কমিয়ে আনতে মডারেটর বা মন্থরক। সে ভাবে কম গতি না হলে নিউট্রন দক্ষভাবে ইউরেনিয়াম-২৩৫ এ শোষিত হতে পারেনা। সেই প্রথম রিয়্যাক্টরে মডারেটর ছিল গ্রাফাইটের বড় বড় খণ্ড– গ্রাফাইট হলো এক রকম নরোম কার্বন, পেন্সিলের শীষে অথবা পিচ্ছিল কারক হিসেবে যা সাধারণত ব্যবহৃত হয়। আধুনিক রিয়্যাক্টরে অবশ্য ভারি পানি (যে পানির অণুতে

ভারি হাইড্রোজেন থাকে), সাধারণ পানি, বা অন্যান্য কিছু ধরনের মডারেটর ব্যবহৃত হয়। আর দরকার হয় ফিশন বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিয়ন্ত্রণ দন্ড যা বোরেন-ষ্টিল, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি দিয়ে তৈরি। এর কাজ হলো নিউট্রন শোষণ করে বিক্রিয়াকে কমিয়ে বা থামিয়ে ফেলা। এর যত বেশি অংশ রিয়্যাক্টরে ঢুকানো হবে তাই বিক্রিয়ার তীব্রতা কমবে– পুরাপুরি ঢুকালে একেবারে থেমে যাবে।

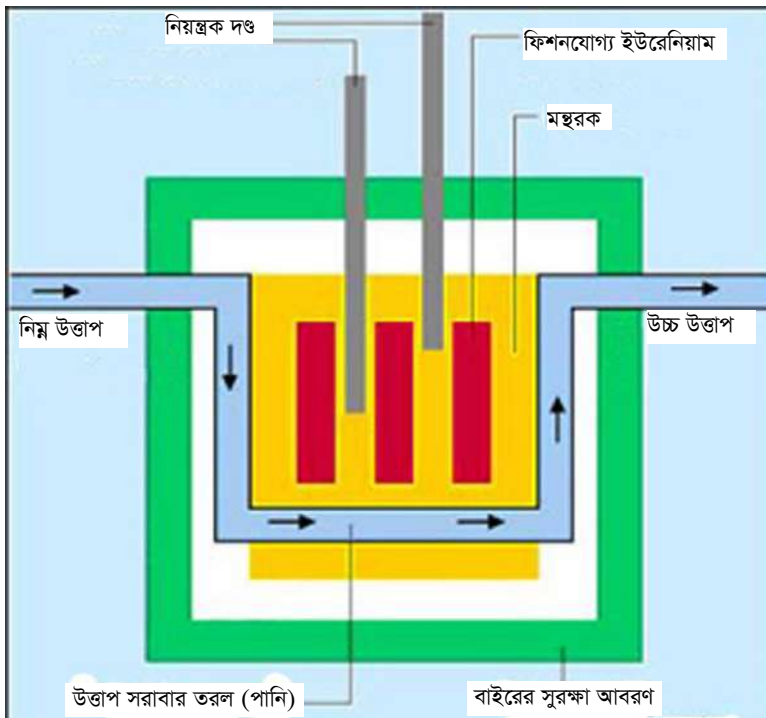

একটি নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরের রেখা চিত্র

বিক্রিয়া চলাকালে প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপ এবং এর থেকে বেরিয়ে আসা নানা কণিকা ও তেজষ্ক্রিয় রশ্মি থেকে সবাইকে রক্ষা করার জন্য পুরো রিয়্যাক্টর অংশটিকে অনেক পুরু কংক্রীট, ষ্টিল ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। তা ছাড়া পানি কিংবা অন্য কোন শীতলীকরণ তরল এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয় একে সীমাবদ্ধ উত্তাপে রাখতে ও তরলের নিয়ে আসা উত্তাপকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, জাহাজ বা সাবমেরিনের ইঞ্জিন চালনা, ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করতে। নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হলো তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা – যেগুলো চিকিৎসা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন

স্বাভাবিক পদার্থকে এর মধ্যে রেখে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি হয়। উপরের সুরক্ষাগুলোর কোন কিছুতে বিঘ্ন ঘটলে, এবং রিয়্যাক্টরের প্রচন্ড উত্তাপ অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বেরিয়ে আসলে অথবা তার অতি ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও রশ্মিগুলো বেরিয়ে আসলে কী হয় তা ইউক্রেনের চেরনোবীল ও আরো সাম্প্রতিক কালে জাপানের ফুকুশিমার দুর্ঘটনায় আমরা দেখেছি। এতে তাৎক্ষণিক সব কিছু উত্তাপে গলিয়ে ফেলা ছাড়াও সুদূরপ্রসারী তেজস্ক্রিয় দূষণ মারাত্মক হয়ে উঠে। তাছাড়া ফিশনের কাজে ব্যবহারের পর নিউক্লিয়ার জ্বালানির যে বর্জ্য সেটি নিরাপদে বহন করা এবং দূর ভবিষ্যতেও ক্ষতিকর না হতে পারার মত নিরাপদে কবর দেয়ার কাজটিও অত্যন্ত দুরূহ ও বিপদসংকুল। ইউরেনিয়াম-২৩৮ নিজে ফিশনযোগ্য না হলেও এক ধরনের রিয়্যাক্টরে অপেক্ষাকৃত দ্রুতগামী নিউট্রন যোগ করে এবং আরো কিছু নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে একে প্লুটোনিয়াম-২৩৯ এ পরিণত করা যায় যা ফিশনযোগ্য বলে নিউক্লিয়ার জ্বালানি হতে পারে। এ ভাবে একই রিয়্যাক্টরে ক্রমাগত জ্বালানি সৃষ্টি ও তার ব্যবহারে শক্তি উৎপাদন উভয়ে চলতে পারে। এরকম রিয়্যাক্টরকে বলে ব্রীডার রিয়্যাক্টর।

শুরুতে কিন্তু ফিশন শক্তির ব্যবহার শান্তিপূর্ণ কাজে হয়নি, নিয়ন্ত্রিত ভাবেও হয়নি, এটি হয়েছে অত্যন্ত বিধ্বংসী বোমা তৈরির কাজে। হিরোশিমা আর নাগাসাকি তারই সাক্ষী। প্রথম বোমা যেটি হিরোশিমায় ফেলা হয়েছিল (ডাক নাম: 'লিটল বয়') তা ছিল ইউরেনিয়াম–২৩৫ জ্বালানির। হঠাৎ করে স্বল্প জায়গায় এই জ্বালানিকে সংকুচিত করে এনে ক্রিটিক্যাল ম্যাস সৃষ্টি করে নিউক্লিয়ার ফিশন চেইন রিয়্যাকশন শুরু করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল এর মধ্যে একটি সাধারণ বোমা। নাগাসাকির উপর ফেলা দ্বিতীয় বোমাটি (ডাক নাম: 'ফ্যাট ম্যান') ছিল প্লুটোনিয়াম জ্বালানির। এই উভয়েরই ধ্বংস যজ্ঞের কথা ভাবলে এখনো মানুষ শিউরে উঠে, হতাশ হয়ে পড়ে। এগুলোর তাৎক্ষণিক আঘাত থেকে বেঁচে ছিলেন এমন অনেকের মৃত্যু হয়েছে বহুদিন পর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে। তারপরও প্রচুর পরিমাণে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি, মোতায়েন, ও পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ হয়েছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা সহ বিশ্ববাসীর প্রতিবাদ ও অনীহার মুখে তা কখনো মারণাস্ত্র হিসেবে আর ব্যবহৃত হয়নি।

নিউক্লিয়ার ফিউশন শক্তি

নিউক্লিয়ার শক্তি সংক্রান্ত গ্রাফটির ডান দিকের অংশটি থেকে বুঝতে পেরেছি যে কোন ভারী নিউক্লিয়াসকে ভেঙ্গে ফেল্‌লে কিছু বাড়তি ভর হাতে আসে যা নিউক্লিয়ায় ফিশন শক্তি হিসেবে আমরা পাই। এবার আমরা নজর দেব গ্রাফটির বাম দিকে। এখানে নিউক্লিয়াসে কণিকা সংখ্যা যত বাড়ছে কণিকাপ্রতি ভর ঘাটতিও তত বাড়ছে। এখন এই পর্যায়ের দুটি খুব হালকা নিউক্লিয়াসকে একত্র করে যদি আমরা অপেক্ষাকৃত বেশি ভরের একটি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করতে পারি তা হলে সেই ভারি নিউক্লিয়াসের ভর ঘাটতি আগের দুটির যোগফলের চেয়ে বেশি হবে। এর মানে এক্ষেত্রেও বাড়তি ভর ঘাটতি নিউক্লিয়ার শক্তি রূপে অবমুক্ত হবে। কিন্তু ফিশন প্রক্রিয়ার চেয়ে এতে শক্তি বেশি পাব কারণ গ্রাফটির উর্দ্ধমুখি প্রবণতা ডান দিকের চেয়ে বা বামদিকেই বেশি খাড়া। এভাবে দুটি হালকা নিউক্লিয়াসকে যুক্ত করে যে শক্তি উৎপাদন তাকে বলা হয় ফিউশন (যুক্ত হওয়া) প্রক্রিয়া এতে ফিশনের চেয়ে বেশি হারে শক্তি লাভ সম্ভব।

ফিউশন বিক্রিয়ার কিছু উদাহরণ আমরা হাইড্রোজেনের নানা আইসোটোপের নিউক্লিয়াসের পরস্পর সংযুক্তি শক্তি অবমুক্ত করার মধ্যে দেখি। যেমন:

$${}^{2}_{1}H + {}^{2}_{1}H \rightarrow {}^{3}_{1}H + {}^{1}_{1}H + \text{শক্তি}$$

এখানে দুটি ডিউটেরিয়াম নিউক্লিয়াস (ভারি হাইড্রোজেন) একত্র হয়ে একটি ট্রিটিয়াম নিউক্লিয়াস (আরো ভারি হাইড্রোজেন) এবং একটি সাধারণ হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়, এবং বাড়তি ভর ঘাটতিটুকু শক্তি রূপে বেরিয়ে আসে। একই ভাবে শেষ পর্যন্ত হাইড্রোজেনের আইসোটোপগুলোর ফিউশনে হিলিয়াম সৃষ্টি হয়ে আরো শক্তি উৎপাদিত হয়। সেটি হাইড্রোজেন বোমার মধ্যে ঘটে, আবার সূর্য সহ আকাশের তারার ভেতরেও ঘটে যার ফলে তারার শক্তি উৎপাদিত হয়। আমরা পৃথিবীতে আমাদের যাবতীয় প্রায় সব শক্তি-উৎসের জন্য প্রকারান্তে সূর্যের শক্তির উপর নির্ভর করি। তেল, কয়লা ইত্যাদি আসলে জীবের ফসিল জাত যা আদিতে সূর্য শক্তি নির্ভর ছিল; আর বায়ু, জলশক্তি ইত্যাদি সূর্যের শক্তিরই সদ্য রূপান্তরিত অবস্থা। এখন জানি সূর্যের সেই শক্তি আসলে নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ায় সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়।

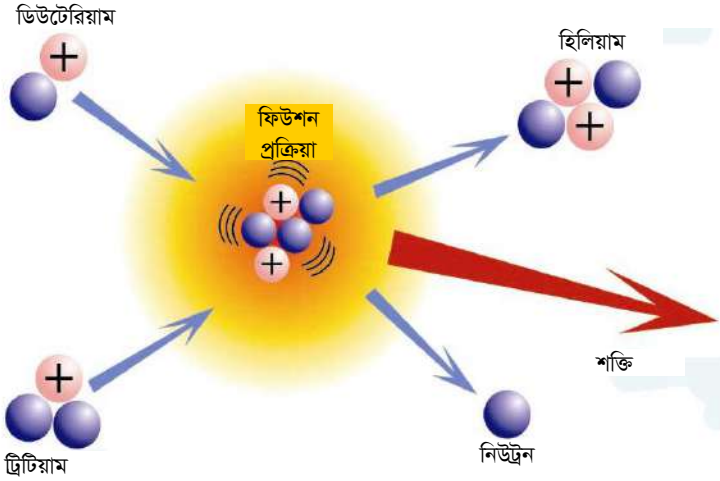

নিউক্লিয়ার ফিউশন

সব ফিউশন বিক্রিয়ার জন্য একটি প্রাথমিক শর্ত রয়েছে। নিউক্লিয়াস মাত্রই ধনাত্মক চার্জে গঠিত বলে কিছু দূরত্বে থাকা দুটি নিউক্লিয়াসকে একীভূত করার জন্য পরস্পর একেবারে কাছে নিয়ে আসতে হয়, যার জন্য শুরুতে প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োজন, এজন্য দরকার অতি উচ্চ প্রাথমিক উত্তাপ। হাইড্রোজেন বোমার মধ্যেই এজন্য একটি ফিশন নিউক্লিয়ার বোমা দিয়ে দেয়া হয় যাতে এর বিস্ফোরণে স্থানীয়ভাবে সে রকম অতি উচ্চ উত্তাপ সৃষ্টি হয়। এটি আসল বোমাটির প্রক্রিয়া অর্থাৎ ফিউশন বিক্রিয়া শুরু করিয়ে দিতে পারে। তারার মধ্যে ফিউশন প্রক্রিয়া প্রথমবার শুরু হওয়ার আগে নিজের প্রচণ্ড চাপ সেখানেও প্রয়োজনীয় উচ্চ উত্তাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু এই উভয় ক্ষেত্রে বিষয়টি অনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া। যদি ফিশন রিয়্যাক্টরের মত বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদির মত কাজে নিয়ন্ত্রিত ফিউশন আমরা ঘটাতে চাই– তা হলে নিয়ন্ত্রিত ভাবে ঐ প্রচণ্ড প্রাথমিক উত্তাপ সৃষ্টিতে সক্ষম হতে হবে যা এখনো সম্ভব হয়নি। প্রয়োজনীয় উত্তাপ সৃষ্টি করা হলে এতে হাইড্রোজেন জ্বালানি ধারণ করার জন্য যে পাত্র প্রয়োজন হবে তার অস্থিত্ব থাকবেনা। তা যে শুধু বাষ্পীভুত হবে তা নয় বরং তার পরমাণুও আর পরমাণু হিসেবে থাকবেনা– নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনে গড়া প্লাজমা বা মেঘে পরিণত হবে। এখন চেষ্টা চলছে উচ্চ চৌম্বক শক্তির মাধ্যমে পাত্র ছাড়াই ফিউশন জ্বালানিকে অন্তত বিক্রিয়া হবার মত খুব স্বল্প সময় এক জায়গায় ধরে রাখা যায় কিনা সেই গবেষণা। ভবিষ্যতে কোনদিন এভাবে নিয়ন্ত্রিত ফিউশন সম্ভব হলে আমরা পানি থেকে হাইড্রোজেন নিয়ে অফুরন্ত নিউক্লিয়ার জ্বালানির অধিকারী হবো।

মৌলিক কণিকার জগত

কণিকা ভাঙ্গার যন্ত্র

যাবতীয় বস্তুর মধ্যে শেষ পর্যন্ত মৌলিক কী রয়েছে যেগুলোর দ্বারা সব বস্তু গঠিত গ্রীক দার্শনিকরা এর উত্তর দিয়েছিলেন পানি, আগুণ, বাতাস, আর মাটিই সব কিছুর মৌলিক উপাদান, এমন কথা বলে। সেটি নিয়ে তখনই প্রশ্ন উঠেছিল এবং পরে নি:সন্দেহ ভাবে তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান সব যৌগিক পদার্থের মৌলিক উপাদান হিসেবে রাসায়নিক অণুকে আবিষ্কার করেছে; আবার সেই অণুও যে গড়া বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে তা দেখিয়েছে। এভাবেই আমরা পরমাণুকেই পদার্থের মৌলিক কণিকা হিসেবে মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু পরে দেখা গেছে পরমাণুর মধ্যে রয়েছে আরো মৌলিক কণিকা– ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াস; শিগ্‌গির এও বুঝা গেছে নিউক্লিয়াস নিজেও প্রোটন আর নিউটন– এই দুই আরো মৌলিক কণিকায় গড়া। একটি জিনিস লক্ষ্যণীয়: যতই আমরা কণিকার আরো গভীরে প্রবেশ করেছি ততই মৌলিক থেকে মৌলিকতর কণিকার সন্ধান পেয়েছি। এভাবে গভীরে প্রবেশ করার জন্য আমাদের প্রয়োজন হয়েছে উচ্চ থেকে উচ্চতর শক্তির বিক্রিয়া ঘটানোর সক্ষমতার– যা হলো উচ্চ শক্তি পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত। ভাগ্যক্রমে এর কিছু কিছু আমরা প্রকৃতিতেই পেয়েছি। মহাশূন্যে ঘটিত উচ্চ শক্তি বিক্রিয়ার ফসল হিসেবে যে কসমিক রে বা মহাজাগতিক রশ্মি নিত্য পৃথিবীর উপর এসে পড়ছে তাতে মৌলিক কিছু কিছু কণিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। বাকিগুলোর জন্য আমাদের নিজেদেরকে কণিকা ভাঙ্গার যন্ত্র বানাতে হয়েছে।

এই উচ্চ শক্তির বিক্রিয়া ঘটাতে, কণিকার মধ্যে প্রবেশ করতে, একে ভাঙ্গতে, অর্থাৎ কণিকার মধ্যে আরো মৌলিকতর কণিকা আছে কিনা দেখতে উচ্চ ত্বরণের মাধ্যমে ছুটে যাওয়া কণিকাই আবার প্রয়োজন। লক্ষ্যবস্তু যেমন ক্ষুদ্র, তা ভাঙ্গার হাতুড়িকেও হতে হচ্ছে ক্ষুদ্র। পরমাণু বা নিউক্লিয়াসকে ভাঙ্গার ক্ষেত্রে এটি আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু মৌলিক কণিকার বিষয়টি কিন্তু প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রনে শেষ হয়ে যায়নি। আরো বেশি শক্তির আঘাতে আরো বেশ কিছু বৈচিত্রের মৌলিক কণিকা উদ্ঘাটিত হয়েছে। সেগুলোর কিছু কিছু হদিশ নেয়া ও তাদের আপাত দৃষ্টিতে অত্যন্ত খামখেয়ালি সব বৈশিষ্টের মধ্যে শৃঙ্খলা দেখার চেষ্টা কী ভাবে হয়েছে তা জানার জন্য এই অধ্যায়ের অবতারণা।

কিন্তু সবার আগে কণিকা ভাঙ্গার যন্ত্রগুলো কীরকম দেখা যাক। এগুলো মূলত কণিকাকে ক্রমাগত ত্বরণের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত উচ্চ বেগে পৌঁছানোর একটি ব্যবস্থা; তাই এদের বলা হয় পার্টিকল এক্সলেরেটর বা কণিকা ত্বরক। কণিকা যদি চার্জযুক্ত হয় তা হলে উচ্চ চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে এর গতি পথ বাঁকানো যায়। যদি এমনভাবে বাঁকানো হয় যে তা বিশাল পরিধির বৃত্তাকারে অনেক পথ ধরে এগুতে পারে তা হলে ত্বরণ লাভের জন্য অনেকখানি পথ এরা পায়। তা ছাড়া লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটার আগে যদি এই বৃত্ত-পথে অনেকবার এরা পাক খেতে পারে তা হলে ত্বরণের জন্য আরো বেশি সুযোগ এরা পায়। ত্বরণটি ঘটে কিন্তু যাত্রাপথে উচ্চ বিদ্যুৎ চৌম্বক শক্তি বার বার এর উপর প্রয়োগ করে অধিক থেকে অধিকতর বেগে নিয়ে যাওয়ার ফলে। এই কণিকা ত্বরকগুলোও আকারে ও শক্তিতে ক্রমেই বড় হয়েছে এখন অনেক কিলোমিটার বৃত্তাকার পথ জুড়ে এরকম অত্যন্ত উচ্চ শক্তির ত্বরক রয়েছে যাতে বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট পর্যায়ের (গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট) শক্তি সঞ্চার করা যায়। এক ইলেকট্রন ভোল্ট হলো একটি ইলেকট্রনকে এক ভোল্ট বিদ্যুৎ চাপে রাখলে এটি যে শক্তি লাভ করে তার পরিমাপ। এ ধরনের অতি শক্তিশালী কণিকা ত্বরক অত্যন্ত ব্যয়বহুল, এবং প্রযুক্তিগত ভাবে অত্যন্ত বড় মাপের উদ্যোগ।

বিশাল এলাকা জুড়ে বৃত্তাকার কণিকা ত্বরক। ভূগর্ভস্থ এই ত্বরকের বৃত্তের ভেতরে ও বাইরে শহর-গ্রামের দৃশ্য।

তাই অত্যন্ত উচ্চ শক্তির এরকম ত্বরক খুব ধনী দেশগুলো ছাড়া তৈরি করতে পারছেনা, আর প্রধানত মৌলিক প্রকৃতির গবেষণার জন্য কোন একটি ধনী দেশও এই রকম ব্যয়ের মধ্যে বড় একটা যেতে চাইছেনা। এজন্য এখানকার সব চেয়ে শক্তিশালী ত্বরকটি হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর মিলিত প্রচেষ্টায় গড়া জেনেভার সার্ন গবেষণা কেন্দ্রের সর্বশেষ মহাকায় কণিকা ত্বরক লার্জ হেড্রন কলাইডার (এল এইচ সি)। এতে প্রোটনের মত অপেক্ষাকৃত ভারী কণিকাকে (যেগুলোকে সাধারণভাবে হ্যাড্রন বলা হয়) দুটি দুই দিক থেকে উচ্চ বেগে এনে মুখোমুখি ১৪ হাজার বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে পারে। পদার্থবিদ্যার, বিশেষ করে মহাবিশ্ব সৃষ্টির মুহূর্তে কণিকা সমূহের যে বিক্রিয়া ঘটেছিল তার পদার্থবিদ্যার, রহস্য উদ্ঘাটনে এই যন্ত্রের সাহায্যে বর্তমান চালু গবেষণাগুলোর দিকে বিজ্ঞানীরা দারুণ আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছেন।

কণিকা ত্বরকের অংশ বিশেষের বিস্তারিত ছবি

প্রতি-কণিকা

উচ্চ শক্তি বিক্রিয়ার মাধ্যমে নূতন নূতন যে সব মৌলিক কণিকা আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোর কথায় যাওয়ার আগে জানা প্রত্যেক কণিকারই যে একরকম বিপরীত ধর্মী অভিন্ন যমজের মত একটি প্রতি-কণিকা রয়েছে সে প্রসঙ্গে যাই। ১৯৩০ সালে প্রথম ইলেকট্রনের প্রতি-কণিকা এভাবে আবিস্কৃত হয় যাকে পজিট্রন বা

পজিটিভ ইলেকট্রন বলা হয়। ইলেকট্রনের ঋণাত্মক চার্জের বদলে তার ঠিক সমান ধনাত্মক চার্জ থাকা ছাড়া অন্য সব গুণের দিক থেকে এরা অভিন্ন – আকার, ভর সব। এজন্যই বিপরীত অভিন্ন যমজের কথা বলেছি। শুধু চার্জের তফাৎ হওয়াতে ইলেকট্রন আর পজিট্রনের গতিবিধি সুন্দর ধরা পড়ে ক্লাউড চেম্বারের মত কণিকা উদ্ঘাটকের ছবিতে। ক্লাউড চেম্বার হলো জলীয় বাষ্প সহ একটি গ্যাসে ভরা পাত্র যার কাচের জানালা রয়েছে। একে ঠান্ডা করলে আকাশে জলীয় বাষ্প জমে মেঘ হবার মত এতেও মেঘ সৃষ্টি হতে পারে। তবে ছোট্ট জলকণায় গড়া মেঘ হবার জন্য একটি ধূলি কণা বা অনুরূপ কিছুকে আশ্রয় করে জলকণা জমতে পারে। ক্লাউড চেম্বারের গ্যাস থেকে যদি ওরকম ধূলি কণা পরিষ্কার করে নেয়া হয়ে থাকে, তা হলে চার্জ বিশিষ্ট কণিকাগুলোই বরং এরকম আশ্রয়ের কাজ করতে পারে। তাই একটি ইলেকট্রন বা অনুরূপ কণিকা ক্লাউড চেম্বারে যে পথ দিয়ে যায় সে পথে জলকণার একটি রেখা সৃষ্টি হয়। জলকণাগুলো তুলনামূলক ভাবে অনেক বড় বলে সে রেখা চোখে দেখা যায়, ফটো তুলে রাখা যায়। একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে ক্লাউড চেম্বারটি রাখা হলে ইলেকট্রনের গতিপথ বেঁকে যাবে, আর সঙ্গে যদি একটি পজিট্রন থাকে তা হলে তার গতি পথ বাঁকবে ঠিক বিপরীত দিকে। যেভাবে ক্লাউড চেম্বারে জোড়ায় জোড়ায় এরকম দুদিকে বাঁকা রেখা দেখা যায় বাঁকানোর পরিমাণ, চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাণ ইত্যাদি পরিমাপ করে বুঝা যায় এগুলো ইলেকট্রন আর পজিট্রনের জোড়া ছাড়া আর কিছু নয়।

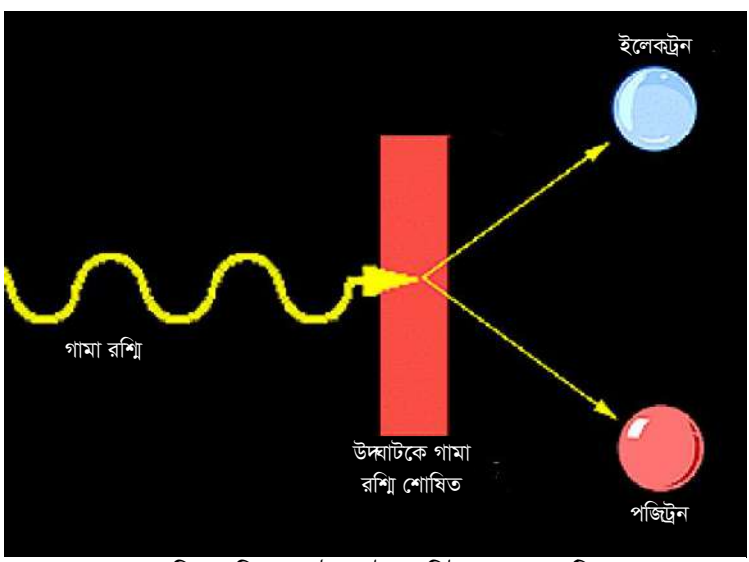

শক্তি শোষিত হয়ে ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়ার সৃষ্টি

অনেক সময় দুটি শক্তি কণা এভাবে কণিকা ও প্রতি-কণিকার একটি জোড়ায় পরিণত হয় যাকে বলা হয় জোড়া সৃষ্টি (পেয়ার প্রডাকশন)। আবার তার ঠিক উল্টো ব্যাপারও হয়– একটি কণিকা ও একটি প্রতি-কণিকা একত্রিত হয়ে উভয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে যাকে বলায় হয় বিনাশ (এনিহিলেশন)। এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় দুটি ফোটন বা শক্তি কণা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য কোন কণিকা। এগুলো শক্তি থেকে ভর, আবার ভর থেকে শক্তি সৃষ্টির সুন্দর উদাহরণ। কণিকা, প্রতি-কণিকা, ফোটন ইত্যাদির ক্ষেত্রে জিনিসগুলো আলাদা আলাদা নিয়ে হিসেব করলে জোড়া সৃষ্টি অথবা বিনাশের আগে এবং পরে মোট শক্তি (ভরের শক্তি রূপ সহ), মোট ভর-বেগ ইত্যাদির নিত্যতা চমৎকার পালিত হয়।

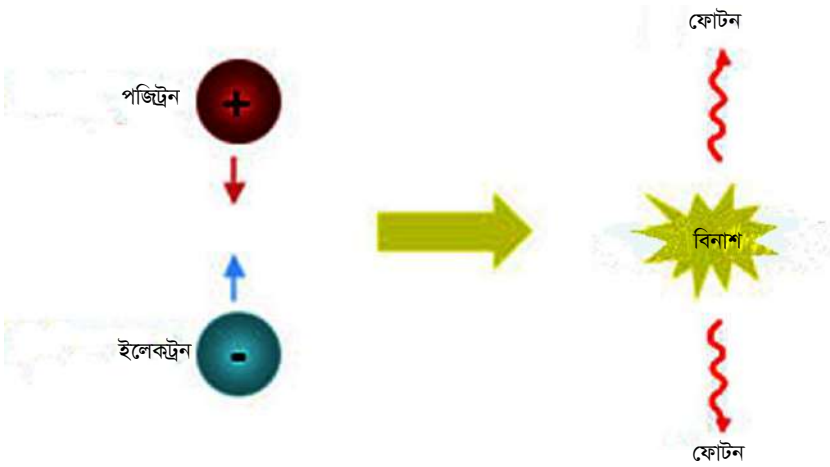

ইলেকট্রন ও পজিট্রনের সংযোগে উভয়ের বিনাশ

এভাবে ইলেকট্রনের যেমন প্রতি-কণিকা হিসেবে রয়েছে পজিট্রন, তেমনি অন্যান্য কণিকারও রয়েছে। যেমন প্রোটনের রয়েছে এন্টি-প্রোটন (যার চার্জ ঋণাত্বক), এবং নিউট্রনেরও প্রতি-কণিকা রয়েছে এন্টি-নিউট্রন। যদিও নিউট্রনের ক্ষেত্রে কণিকা ও প্রতি-কণিকা উভয়েই চার্জ বিহীন তবে তাদের মধ্যে অন্য রকম পার্থক্য রয়েছে। বাকিদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু আমরা পরে দেখবো।

প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রন কণিকায় যেমন পরমাণু গড়ে উঠে, তেমনি এদের প্রতি-কণিকা– এন্টি-প্রোটন, এন্টি-নিউট্রন এবং পজিট্রন নিয়ে গঠিত হয় প্রতি-পরমাণু। পরমাণুর সমন্বয়ে যেমন সৃষ্টি হয় পদার্থ তেমনি প্রতি-পরমাণুর সমন্বয়ে

সৃষ্টি হতে পারে, প্রতি-পদার্থ। কিন্তু মহাবিশ্বের ইতিহাসে সুদূর অতীতে প্রকৃতির মধ্যে কণিকার তুলনায় প্রতি-কণিকা হয়ে গিয়েছিল কিছু কম। তাই দীর্ঘ সময়ে কণিকা ও প্রতি-কণিকার মিলনে বিনাশের মাধ্যমে বস্তুর অধিকাংশই শক্তিতে পরিণত হলেও বাড়তি কণিকাগুলো বর্তমান বস্তুরূপে রয়ে গেছে। প্রতি-কণিকা আর প্রকৃতিতে বাকি থাকেনি। কিন্তু উচ্চশক্তির বিক্রিয়ায় আলাদা আলাদা ভাবে কখনো কখনো সৃষ্টি হচ্ছে প্রতি-কণিকা, যা আমাদের উদ্ঘাটকে ধরা পড়ছে।

পরমাণুর ভেতরে বাইরে আরো কণিকা

আমরা পরমাণুর গঠনে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনই শুধু পেয়েছি। এখন তাদের প্রতি-কণিকাগুলোও দেখলাম। এই সব কণিকা ও প্রতি-কণিকাগুলোর মধ্যে তেজষ্ক্রিয় পরমাণুর নিউট্রন ছাড়া সবই একেবারে স্থায়ী। এজন্যই পরমাণুও স্থায়ী, যদি তা তেজষ্ক্রিয় পদার্থের না হয়। তেজষ্ক্রিয় নিউক্লিয়াসে নিউট্রনকে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনে পরিণত হতে দেখেছি বীটা অবক্ষয়ে। বীটা অবক্ষয় অবশ্য দুভাবে হতে পারে। যেভাবে আমরা আগে দেখেছি তাতে বিক্রিয়াটি হলো:

$$n \rightarrow \quad p^{+} + \quad e^{-} \quad + \bar{\upsilon}_e$$

নিউট্রন   প্রোটন   ইলেকট্রন এন্টি-নিউট্রিনো

বীটা অবক্ষয়ের অন্য বিক্রিয়াটিতে আমরা পজিট্রন এবং নিউট্রিনো পাই প্রোটনের অবক্ষয়ে:

$$p^{+} \quad \rightarrow \quad n \; + \quad e^{+} \quad + \quad \upsilon_e$$

প্রোটন   বিউট্রন   পজিট্রন   নিউট্রনো

প্রোটন যখন আলাদা থাকে তখন এই বিক্রিয়া সম্ভব নয়, কারণ প্রোটনের ভর নিউট্রনের চেয়ে কম, তাই এটি ভর ও শক্তির মিলিত নিত্যতা রক্ষা করতে পারেনা। কিন্তু নিউক্লিয়াসে অন্য কণিকার সঙ্গে আবদ্ধ অবস্থার নিউট্রন ও প্রোটনের বন্ধন শক্তিতে পার্থক্য থাকলে ঐ নিত্যতা মানা সম্ভব হতে পারে। নূতনের মধ্যে আমরা ঐ ভুতুড়ে প্রায় ভরহীন নিউট্রিনোকেও কণিকা ও প্রতি-কণিকা হিসেবে দেখলাম। শুধু তাই নয় এর চিহ্ন υ এর নীচে একটি e যোগ করে বুঝাবার চেষ্টা করেছি যে এই নিউট্রিনো ইলেকট্রনের সঙ্গে জড়িত, একে বলতে পারি ইলেকট্রন-নিউট্রিনো। এন্টি-নিউট্রিনোর ক্ষেত্রেও এটি ইলেকট্রন-

এন্টি-নিউট্রিনো। অন্য একটি কণিকা মিউয়নের সঙ্গে জড়িত অন্য রকমের নিউট্রিনো ও তার প্রতি-কণিকা রয়েছে। সেগুলোকে বলা হয় মিউয়ন-নিউট্রিনো এবং মিউয়ন-এন্টি-নিউট্রিনো। মিউয়ন নামটি এসেছে গ্রীক অক্ষর মিউ থেকে। আলফা কণিকা, বীটা কণিকার ক্ষেত্রেও গ্রীক অক্ষরের ব্যবহার আমরা দেখেছি।

মিউয়ন কণিকাটি অস্থায়ী ধরনের এক রহস্যময় কণিকা যা নানা বিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে এক সেকেন্ডের ২০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে অবক্ষয়িত হয়ে অন্য কিছুতে পরিণত হতে পারে। স্থায়ী যে ক'টা কণিকাকে আমরা পরমাণুর মধ্যে বা তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়ে দেখেছি তার বাইরে আরো কিছু কণিকা উচ্চ শক্তি নানা বিক্রিয়ায় উদ্ঘাটিত হয়েছে – এগুলো প্রায় সবই খুবই অস্থায়ী প্রকৃতির। মিউয়ন সেগুলোরই একটি। মিউয়নের সঙ্গে ভাবে সাবে ইলেকট্রনের অনেক মিল আছে, তবে পার্থক্যটি হলো এর ভর ইলেকট্রনের চেয়ে ২০৭ গুণ বড়। বলা বাহুল্য ক্ষণস্থায়ী মিউয়নের প্রতি-কণিকা রয়েছে– পজিটিভ মিউয়ন– যা তার মতই ক্ষণস্থায়ী।

ইলেকট্রন-নিউট্রিনো এবং মিউয়ন-নিউট্রিনোর মত আরো এক ধরনের নিউট্রিনো রয়েছে টাউ-নিউট্রিনো এবং তার প্রতি-কণিকা। বুঝাই যাচ্ছে এক্ষেত্রে নিউট্রিনোটি আরেকটি কণিকা টাউ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। টাউ নামটিও এসেছে আরেকটি গ্রীক অক্ষর থেকে। এই টাউও ইলেকট্রন জাতীয় কণিকা কিন্তু ভর মিউয়নের চেয়েও অনেক বেশি। এই ভরের পার্থক্য সত্ত্বেও ইলেকট্রন, মিউয়ন, এবং টাউ এর অন্যান্য সব সাদৃশ্যগুলো এদেরকে একই চরিত্র দিয়েছি। এমনি একই চরিত্রের কণিকা হচ্ছে সব ধরনের নিউট্রিনোগুলো– ইলেকট্রন-নিউট্রিনো, মিউয়ন-নিউট্রিনো এবং টাউ- নিউট্রিনো।

যে সব কণিকা ত্বরক যন্ত্রকে ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী করে তৈরি করা হচ্ছে তাতে শক্তিশালী কণিকা অন্য কণিকার সঙ্গে সংঘর্ষ করে যে প্রচণ্ড ভাঙচুর চালাচ্ছে তার ভগ্নাংশ ও ধ্বংসস্তুপের ফাঁক ফোকরে দেখা পাওয়া গেছে এই সব কণিকা। তা ছাড়া মহাজাগতিক ভাঙচুরের কারণে মহাশূন্য থেকেও পৃথিবীতে এসে পড়ছে কসমিক রে বা মহাজাগতিক রশ্মি নামে পরিচিত রশ্মি যার মধ্যে এরকম নূতন অস্থায়ী কণিকাগুলোর সাক্ষাৎ মেলে– উর্দ্ধাকাশেই অবশ্য বেশি। মিউয়নের মত কণিকা এখানেও মেলে।

কণিকা ত্বরকের ভাঙচুরের মধ্যে আমরা মিউয়ন বা টাউ কণিকাকে অথবা তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিউট্রিনোকে যেমন আবিষ্কার করেছি তেমনি কণিকা ত্বরকের

সাহায্যে নিউট্রন আর প্রোটনের গভীরে প্রবেশ করে তাদের মধ্যে আর কতগুলো কণিকার অস্থিত্বের কথা জানতে পেরেছি। এগুলো হলো প্রোটন আর নিউট্রনের উপাদান– নাম দেয়া হয়েছে কোয়ার্ক। নিউট্রন বা প্রোটন যে নিজেদের পূর্ণ স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে পারেনা তাতো আমরা বীটা অবক্ষয়েই এদের একটিকে আরেকটিতে পরিণত হতে ও নিজেদের ভেতর থেকে ইলেকট্রন বা পজিট্রন ত্যাগ করতে দেখেই বুঝেছি। এখন দেখছি স্বাভাবিক অবস্থায় এরা আরো মৌলিক কণিকা কোয়ার্ক দিয়ে গড়া – এক রকম কোয়ার্ক দিয়ে নয়, বরং দু'রকমের। একটিকে নাম দেয়া হয়েছে আপ কোয়ার্ক অন্যটিকে ডাউন কোয়ার্ক – বিশেষ

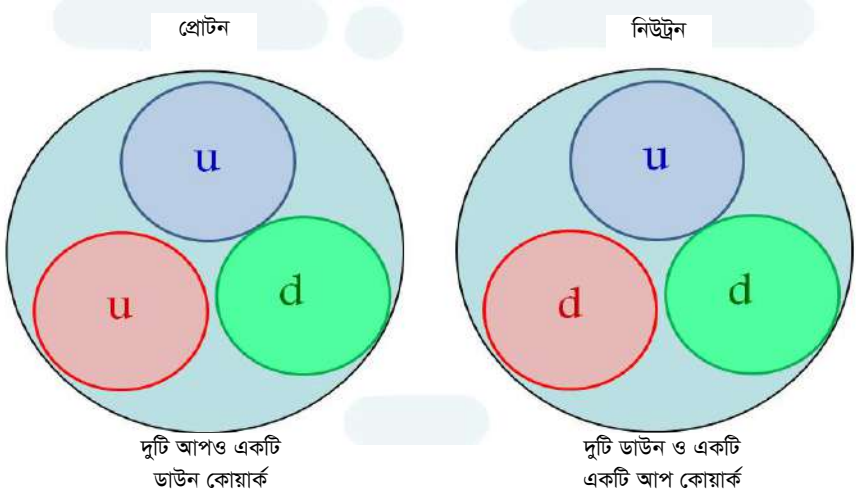

কোয়ার্কের সমন্বয়ে গড়া প্রোটন ও নিউট্রন

কোন কারণে নয় নেহাৎ হাতের কাছে অন্য কোন নাম ছিলনা বলেই এমন নাম দেয়া। দেখা গেল প্রোটন গঠিত হয় দুটি আপ কোয়ার্ক এবং একটি ডাউন কোয়ার্ক দিয়ে, আর নিউট্রন গঠিত হয় দুটি ডাউন কোয়ার্ক আর একটি আপ কোয়ার্ক দিয়ে। কোয়ার্ককে অবশ্য প্রোটন আর নিউট্রনের বাইরে আলাদা করে এখনো পাওয়া যায়নি, তবুও কোয়ার্ক যে প্রোটন ও নিউট্রনের মৌলিকতর উপাদান তা এখন প্রতিষ্ঠিত। তাই আমাদের স্থায়ী বস্তু জগৎ (পরমাণু) শেষ বিচারে শুধু দুরকম কোয়ার্ক আর ইলেকট্রনে গড়া – এ কথা এখন আমরা বলতে পারি।

অতি শক্তিশালী কণিকা ত্বরকের দ্বারা ভাঙচুর করা নানা কণিকার ধ্বংসস্তুপের মধ্যে আরো চার রকমের কোয়ার্কের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই হালকা

মেজাজের যেনতেন রকমের নাম দেবার অভ্যাস অনুসরণ করে এই চারটি কোয়ার্কের নাম দেয়া হয়েছে চার্ম, ষ্ট্র্যাঞ্জ, বটম এবং টপ।

এ পর্যন্ত এই যে সব বস্তু-কণিকার কথা বলা হলো মোটের উপর এদেরকে তিনটি কণিকা-সেট বা কণিকা পরিবার হিসেবে দেখা যেতে পারে। এক এক পরিবারে যেমন বাবা, মা, পুত্র, কন্যা এরকম নানা ধরনের সদস্য থাকে এবং আদর্শ পরিবারে যদি সব ধরনের সদস্য সংখ্যা সুনির্দিষ্ট থাকে, তিন রকমের কণিকা-পরিবারেও তাই থাকে। প্রত্যেক কণিকা পরিবারের একটি সদস্য হবে ইলেকট্রন অথবা ইলেকট্রন তুল্য কিছু। আর একটি সদস্য হবে ইলেকট্রন-নিউট্রিনো বা তার তুল্য কিছু। আর একটি হবে আপ-কোয়ার্ক বা তার তুল্য কিছু, এবং সর্বশেষ সদস্য হবে ডাউন কোয়ার্ক বা তার তুল্য কিছু।

প্রথম পরিবারটি আমরা দেখেই ফেল্‌লাম– ইলেকট্রন, ইলেকট্রন-নিউট্রিনো, আপকোয়ার্ক ও ডাউন-কোয়ার্ক নিয়ে। দ্বিতীয় পরিবারটি হলো মিউয়ন, মিউয়ন-নিউট্রনো, চার্ম-কোয়ার্ক, এবং ষ্ট্র্যাঞ্জ-কোয়ার্ক নিয়ে। আর তৃতীয় পরিবারটি হলো টাউ, টাউ-নিউট্রিনো, টপ-কোয়ার্ক ও বটম-কোয়ার্ক নিয়ে। এর মধ্যে প্রথম পরিবারটি দিয়েই আমাদের পরিচিত বস্তু জগতের অর্থাৎ এর সকল পরামাণু গঠনের কাজ দিব্যি চলে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও বাকি কণিকা-পরিবারগুলো কেন রয়েছে, কেন এই বাড়তি দুই পরিবারের সদস্যদেরকে পাওয়া যাচ্ছে কণিকা ত্বরকের সৃষ্ট ভাঙচুরের মধ্যে, এসব প্রশ্নের উত্তর এখনো বিজ্ঞানীদের জানা নেই। এরকম পরিবারের সংখ্যা তিনটি কেন, বেশি বা কম নয় কেন, এমন প্রশ্নেরও নয়। এ সবের পেছনে ব্যাখ্যাকারী ভাল তত্ত্ব পাওয়ার চেষ্টায় রয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তবে সর্বাধুনিক কণিকা তত্ত্বে এই তিন কণিকা পরিবার নিয়ে গড়া কণিকাগুলো একটি প্রধান ভূমিকা পালন করছে। এতে সুন্দর দুটি ভাগ দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক ভাগে ৬টি করে কণিকা। ইলেকট্রন ও ইলেকট্রন তুল্য কণিকাগুলো, ইলেকট্রন-নিউট্রিনো ও তার তুল্য কণিকাগুলো মিলে যে ৬টি কণিকা এদের ভর কম, পরস্পরের সম্পর্ক বেশি, এদের সবগুলোর সাধারণ নাম হলো লেপটন। আর বাকি ৬টি হচ্ছে ৬ রকমের কোয়ার্ক। লেপটন আর কোয়ার্ক নিয়েই গঠিত আমাদের সেই তিন কণিকা পরিবার।

এই কণিকা পরিবারগুলো ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। আমরা বলেছি প্রত্যেক পরিবারের একটি কণিকা ইলেকট্রন অথবা ইলেকট্রন তুল্য একটি কণিকা, এ রকম অন্যান্য সদস্যরা অন্য রকমের। দেখা যায় ইলেকট্রন তুল্য যাদের বলছি তার প্রত্যেকটির নানা গুণাগুণ ইলেকট্রনের মতোই, তবে প্রথম

পরিবারে এটির (অর্থাৎ ইলেকট্রনের) ভর খুব কম। দ্বিতীয় পরিবারে (মিউয়নের) এর চেয়ে বেশি; আর তৃতীয় পরিবারের (টাউ এর) আরো বেশি। এমনি অন্যান্য সদস্যরাও পর পর পরিবারে ভরটি ক্রমে বেশি, কিন্তু বাকি গুণাগুণ প্রায় একই। প্রকৃতিতে (যেমন কসমিক রে' তে) অথবা কণিকা ত্বরকের মধ্যে কণিকা ভাঙচুরের ভেতর ক্ষণস্থায়ী আরো নানা রকম কণিকা উদ্ঘাটিত হয়েছে বটে, কিন্তু এই জাতীয় বস্তু কণিকার ক্ষেত্রে ঘুরে ফিরে কিন্তু এই তিন পরিবারের সদস্যদের দ্বারা তারা গঠিত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই এসবের মধ্যে একটি সুন্দর শৃঙ্খলা রয়েছে।

এই শৃঙ্খলাটি আমরা আরো ভাল ভাবে দেখি যদি একই কণিকা এবং তার তুল্য অন্য পরিবারের অনুরূপ সদস্যদের মধ্যে যে ভর ছাড়া সব গুণ একই বলেছি সেগুলোর একটির দিকে তাকাই। এই গুণগুলোকে বলা হয় চার্জ। এ পর্যন্ত আমরা শুধু এক ধরনের চার্জের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছি তা হলো বৈদ্যুতিক চার্জ। এটি ধনাত্মক (পজিটিভ) অথবা ঋণাত্মক (নেগেটিভ) হতে পারে এবং ইলেকট্রনের চার্জকে একক হিসেবে ধরে এটি ইলেকট্রনে– ১ এবং প্রোটনে + ১ হতে দেখেছি, অন্য কোন কণিকায় সেভাবে আছে কিনা দেখিনি। এখন ঐ তিন পরিবারভুক্ত কণিকাদের সবার ক্ষেত্রে আবার যদি এই বৈদ্যুতিক চার্জের একটু খবর নিই তাহলে দেখবো ইলেকট্রনের যেমন এটি-১ তেমনি এর সমতুল্য অন্য পরিবারে মিউয়ন ও টাউ এর ক্ষেত্রেও এটি -১। ইলেকট্রন-নিউট্রিনোর ক্ষেত্রে এটি ০। তেমনি সমতুল্য মিউয়ন-নিউট্রিনো এবং টাউ-নিউট্রিনোর ক্ষেত্রেও ০। কোয়ার্কের ক্ষেত্রে এসে দেখি আমাদের পরিচিত প্রথম পরিবারে আপ-কোয়ার্কের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক চার্জ + $\frac{২}{৩}$ এই প্রথম আমরা একটি ভগ্নাংশ চার্জের সাক্ষাৎ পেলাম; আর ডাউন-কোয়ার্কের বৈদ্যুতিক চার্জ - $\frac{১}{৩}$। এখন বুঝতে পারি কেন প্রোটন গঠিত হয়েছে দুটি আপ ও একটি ডাউন কোয়ার্কে যে জন্য প্রোটনের মোট বৈদ্যুতিক চার্জ + ১; আর নিউট্রন গঠিত হয়েছে দুটি ডাউন ও একটি আপ কোয়ার্কে যে জন্য নিউট্রনের মোট বৈদ্যুতিক চার্জ ০।

আপ-কোয়ার্কের বৈদ্যুতিক চার্জ যেমন + $\frac{২}{৩}$ সে রকম অন্যান্য পরিবারে সমতুল্য চার্ম-কোয়ার্ক এবং টপ-কোয়ার্কের চার্জও + $\frac{২}{৩}$ । অন্যাদিকে ডাউন- কোয়ার্কের

বৈদ্যুতিক বৈদ্যুতিক চার্জ যেমন - $\frac{১}{৩}$, তেমনি সমতুল্য ষ্ট্র্যাঞ্জ-কোয়ার্ক ও বটম-কোয়ার্কের বৈদ্যুতিক চার্জ - $\frac{১}{৩}$।

এ পর্যন্ত আমরা এই সিরিজের এবং এই বইয়ের যেখানেই চার্জ কথাটি বলেছি তখনই তার দ্বারা বুঝিয়েছি বৈদ্যুতিক চার্জকে। স্পষ্টত এটি সম্পর্কিত রয়েছে বিদুৎ-চৌম্বক বলের সঙ্গে। কিন্তু এটি ছাড়াও সম্পূর্ণ ভিন্ন আরো তিন রকমের বল আমরা দেখেছি– মহাকর্ষ বল, নিউক্লিয়ার দুর্বল বল, এবং নিউক্লিয়ার সবল বল। মহাকর্ষ বলকে যদি আপাতত আলোচনা থেকে বাদ দিই কারণ এর সঙ্গে সম্পর্কিত কোন চার্জ এখনো স্পষ্ট নয়, অন্য দুটি বলের ক্ষেত্রে ভিন্ন রকমের 'চার্জের' বিষয় উদ্ঘাটিত হয়েছে– যার ধারণাগত ও গাণিতিক প্রকাশ অনেকটাই বৈদ্যুতিক চার্জেরই অনুরূপ। এদের একটিকে বলতে পারি দুর্বল চার্জ– যা নিউক্লিয়ার দুর্বল বলের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং অন্যটিকে বলতে পারি সবল চার্জ– যা নিউক্লিয়ার সবল বলের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখন আমরা দেখতে পারি ঐ তিন পরিবারের সদস্য কণিকাদের মধ্যে এই দুই নূতন চার্জ কার কী রকম রয়েছে।

ইলেকট্রনের এবং তার সমতুল্যদের দুর্বল চার্জ - $-\frac{১}{২}$, সবল চার্জ ০। ইলেকট্রন-নিউট্রিনো এবং তার সমতুল্যদের দুর্বল চার্জ + $\frac{১}{২}$, সবল চার্জ ০। এমনটিই তো আমরা আশা করতে পারি, কারণ আমরা জানি ইলেকট্রন এবং ইলেকট্রন-নিউট্রিনো নিউক্লিয়ার দুর্বল বিক্রিয়ায় (বীটা অবক্ষয়ে) অংশ নেয় কিন্তু নিউক্লিয়ার সবল বিক্রিয়ায় তাদের কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু প্রোটন ও নিউট্রনের ভূমিকা কিন্তু সবল ও দুর্বল উভয় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেই রয়েছে। তাই দেখা যাক কোয়ার্কের ক্ষেত্রে এই চার্জগুলো কী রকম?

এখানে এসে নামকরণে একটু ধাক্কা খেতে হবে। কোয়ার্কের ক্ষেত্রে সবল চার্জের কোন পরিমাণের চাইতেও তার গুণটিই প্রধান এবং সেই গুণটি কোন কারণ ছাড়াই লাল, সবুজ, নীল এই তিনটি রঙের নামে প্রকাশ করা হয়। এভাবে আপ-কোয়ার্কের ও তার সমতুল্যদের ক্ষেত্রে আমরা পাই দুর্বল চার্জ + $\frac{১}{২}$, এবং সবল চার্জ লাল, সবুজ আর নীল। তেমনি ডাউন-কোয়ার্ক ও সমতুল্যদের ক্ষেত্রে দুর্বল

চার্জ - $\frac{১}{২}$, এবং সবল চার্জ লাল, সবুজ আর নীল। খুব অদ্ভুত মনে হলেও, এসব চার্জের ধারণা বৈদ্যুতিক চার্জের মত আমাদের দৈনন্দিন এত পরিচিত না হলেও বস্তু জগতের উদ্ঘাটিত অনেক মৌলিক কণিকার ভীড়ে একটি শৃঙ্খলা আনার কাজে এই ব্যাপক অর্থে চার্জের ধারণাটি খুবই কাজে আসছে।

শক্তি বাহক কণিকা

আমরা এ পর্যন্ত শুধু বস্তুর কণিকাগুলোকে বিবেচনা করেছি। কিন্তু ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি আলো সহ বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তিরও কণিকা রূপ রয়েছে এবং তার কণিকা হলো ফোটন। তেমনি অন্যান্য বলের সঙ্গে জড়িত যে শক্তি তাদেরও বাহক কণিকা রয়েছে– মহাকর্ষ, নিউক্লিয়ার দুর্বল এবং নিউক্লিয়ার সবল বলের বাহক কণিকা। নিউক্লিয়ার দুর্বল বলের কণিকা হলো দুর্বল গেজ বোসন, এবং নিউক্লিয়ার সবল বলের কণিকা হলো গ্লুয়ন। মহাকর্ষ বলের ক্ষেত্রেও একটি কণিকার কথা ধরে নেয়া হয়েছে গ্র্যাভিটন নামের, যদিও এটি সম্পর্কে এখনো আমরা তেমন কিছু জানিনা। নামের মধ্যেই তাদের মূল কাজটির একটি ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। ফোটন কথাটি এসেছে ফটো বা আলো থেকে, গ্লুয়ন এসেছে গ্লু বা আঠার মত কোয়ার্কদের একত্র রাখে বলে। গ্র্যাভিটন যে মহাকর্ষের বা গ্র্যাভিটির কণিকা তাতো নাম থেকে আরো স্পষ্ট। গেজ বোসনের নামকরণের কথাটি একটু পরে বুঝবো। বৈদ্যুতিক চার্জের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণের যে বিক্রিয়া তার জন্য দায়ী ফোটন কণিকার আদান প্রদান। তেমনি দুর্বল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দায়ী দুর্বল গেজ বোসন এবং সবল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রোটন বা নিউট্রনের মধ্যে কোয়ার্কের বিক্রিয়ার জন্য দায়ী গ্লুয়ন।

বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত কণিকার মধ্যে ফোটনের বিনিময়ের মাধ্যমে বিদ্যুৎ-চৌম্বক বলের সৃষ্টি হয়, তেমনি দুটি কোয়ার্কের মধ্যে গ্লুয়ন বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় সবল বল। এই দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে একটি পার্থক্য হলো ফোটনের নিজের কোন ধরনের চার্জ নেই, কিন্তু গ্লুয়নের নিজেরও সবল চার্জ রয়েছে। এই কারণে গ্লুয়ন নিজেও অন্য গ্লুয়নের সঙ্গে সবল বলে বিক্রিয়া করে। এর ফল হয় কোয়ার্ক বিক্রিয়ায় গ্লুয়নের ভূমিকার ক্ষেত্রে কোয়ার্কগুলো কোন অবস্থাতেই পরস্পরের থেকে দূরে যেতে পারেনা, সব সময় এদের কয়েকটি একত্র হয়ে একটি সম্মিলিত কণিকা গঠিত হয়– প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি। এই সম্মিলিত কণিকাগুলো অপেক্ষাকৃত ভারি হয়ে থাকে এবং সাধারণ ভাবে এদের হ্যাড্রন বলা হয়।

জেনেভায় যে লাজ হ্যাড্রন কলাইডার নামক ত্বরক যন্ত্র সেখানে হ্যাড্রনের সঙ্গে হ্যাড্রনের সংঘর্ষেই প্রচণ্ড শক্তি সৃষ্টি করা হয় বলেই তার ঐ নাম।

কোয়ার্ক যে রকম হ্যাড্রনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তার বাইরে যেতে পারেনা, গ্লুয়নও সে রকম পারেনা, একই কারণে। তাই হ্যাড্রনগুলোর মধ্যে – প্রোটন বা নিউট্রনের মধ্যে– যে নিউক্লিয়ার সবল বল, যা নিউক্লিয়াসের ভেতর এগুলোকে জড়াজড়ি করে রাখে, সেখানে গ্লুয়নের সরাসরি কোন ভূমিকা নেই। সেখানে কিন্তু শক্তির বাহক হিসেবে কাজ করে মেসন নামের অন্য কণিকা। মেসন নিজেও কিন্তু কোয়ার্কে তৈরি– একটি কোয়ার্ক এবং একটি এন্টি-কোয়ার্কে গড়া। প্রোটন বা নিউট্রনের চেয়ে কম ভরের কিন্তু ইলেকট্রনের চেয়ে বেশি ভরের মাঝামাঝি ধরনের এই মেসন কিন্তু কয়েক রকমের আছে, এবং প্রোটন-প্রোটন, প্রোটন-নিউট্রন, অথবা নিউট্রন-নিউট্রন জোড়ার মধ্যে বিনিময় হতে থাকার মাধ্যমে নিউক্লিয়ার শক্তির সৃষ্টি করাতেই আমাদের কাছে মেসনের প্রধান ভূমিকা– বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত হালকা কিছু মেসনের। বলা বাহুল্য মেসন কণিকা ক্ষণস্থায়ী কণিকা, অন্য অনেক কণিকার মত। আর নিজেরাও আরো মৌলিক কোয়ার্কে গড়া বলে এরা পরম মৌলিকত্ব দাবী করতে পারেনা, যেমন পারেনা, প্রোটন ও নিউট্রন।

নিউক্লিয়ার দুর্বল বলের শক্তি কণিকা হিসেবে কাজ করে দুর্বল গেজ বোসন নামে পরিচিত দুটি কণিকা – W বোসন ও Z বোসন। আসলে সব বিভিন্ন ধরনের বলের বাহক সব শক্তি কণিকাকেই সাধারণ ভাবে গেজ বোসন বলা হয়। এদের মধ্যে ফোটন ও গ্লুয়নকে আমরা আগেই দেখেছি। দুর্বল বলের ক্ষেত্রে দু'রকমের W বোসন আর Z বোসন এই কাজটি করে। এই দুটি কণিকা মৌলিক কণিকাদের মধ্যে বলতে গেলে সব চেয়ে ভারীদের অন্যতম– প্রোটনের চেয়েও প্রায় ১০০ গুণ ভারি। এরা ভারি হবার কারণেই এরা যে শক্তির দূতিয়ালি করে সেই দুর্বল বলের কার্যকর হবার দূরত্ব অতি কম। অন্যদিকে ফোটনের কোন ভরই নেই, তাই এরা যার দূতিয়ালি করে সেই বিদ্যুৎ-চৌম্বক বলের কার্যকর হবার দূরত্ব অনেক খানি পর্যন্ত বিস্তৃত। গ্লুয়নেরও ভর না থাকলেও তার ক্ষেত্রে কার্যকারিতার দূরত্ব কম ভিন্ন কারণে। W নামটি এসেছে weak বা দুর্বলের আদ্যাক্ষর থেকে। আর Z বোসন সব শেষে এসে মৌলিক কণিকার প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব যা ষ্ট্যান্ডার্ড মডেল বলে পরিচিত তাতে শেষ গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হিসেবে দেখা দিয়েছে বলে রোমান বর্ণমালার শেষ অক্ষরেই তার নাম হয়েছে। আসলে আবদুস সালাম (পাকিস্তানী বিজ্ঞানী), গ্ল্যাশো, এবং ভাইনবার্গের বিখ্যাত আবিষ্কারে

বিদ্যুৎ চৌম্বক বল ও নিউক্লিয়ার বল একীভূত করে তাঁরা যে তাত্ত্বিক বর্ণনা দিয়েছিলেন এর সত্যতা প্রমাণের জন্য তাতে ভবিষ্যদ্বানী করা W ও Z বোসনকে বাস্তবে খুঁজে পাওয়া দরকার ছিল। অবশেষে ১৯৮৩ সালে কণিকা ত্বরকে উদ্ঘাটিত W ও Z বোসনের সব গুণাগুণ তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে মিলে গিয়েছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে কণিকাগুলো

যতগুলো শক্তি বাহক কণিকা আমরা দেখলাম তার সব গুলোকেই বলা হয় গেজ বোসন। গেজ কেন বলা হয় সে আলোচনায় গেলামনা। কিন্তু বোসন কেন বলা হয় তা জানা আমাদের জন্য খুব জরুরী, বিশেষ করে আমরা যারা বাঙালী এবং আরো বিশেষ করে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা করেছে বা এর সঙ্গে কোন ভাবে জড়িত। কারণ এই বোসন নামটি এসেছে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম থেকে যিনি ১৯২৪ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন, এবং এখানেই তরুণ বয়সে আবিষ্কার করেছিলেন ফোটনের মত কণিকার বিশেষ সংখ্যাতত্ত্ব। আইনষ্টাইনেরও অবদান এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল বলে একে বলা হয় বোস-আইনষ্টাইন সংখ্যায়ন। ঐ যে বোসন নামের কণিকাগুলো – বসুর এই সংখ্যায়ন মেনে চলে বলেই ওগুলোর এই নাম। ফোটন, গ্লুয়ন, W কণিকা, Z কণিকা এমনি সব বোসন – গেজ বোসন। তাছাড়াও অন্য বোসন আছে, যাদের কথায় একটু পর আছি।

বসু সংখ্যায়ন মেনে চলার কিছু তাৎপর্য রয়েছে। যেমন এতে যে কোন কণিকার দুটিকে নিয়ে যদি দুটার মধ্যে অদল বদল করি তা হলে এর সামগ্রিক ওয়েভ ফাংশনে কোন পরিবর্তন আসবেনা। সিরিজের প্রথম বইটিতে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার আরোচনায় আমরা দেখেছি ওয়েভ ফাংশন হলো কোন সিষ্টেমের অবস্থা বর্ণনা করা সম্ভাবনা তরঙ্গের উচ্চতা, এক্ষেত্রে দুটি কণিকার সিষ্টেমের। অন্য ধরনের কণিকাগুলো মেনে চলে ফার্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন নামের অন্য একটি সংখ্যায়ন; সেই কণিকাগুলোকে বলা হয় ফার্মিয়ন। ফার্মিয়নদের ক্ষেত্রে ওরকম অদল বদল করলে ওয়েভ ফাংশন এক থাকেনা।

কণিকা মাত্রেরই এক রকম নিজের অক্ষের উপর ঘূর্ণনের মত আচরণ রয়েছে যাকে কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক ভাবে একটি সংখ্যা দিয়ে সূচিত করা যায়, যাকে বলা হয় স্পিন। বোসন কণিকাগুলোর স্পিন সব সময় পূর্ণ সংখ্যা, অথবা ০। কিন্তু

ফার্মিয়ন কণিকার স্পিন হয় সব সময় পূর্ণ সংখ্যার অর্ধেক। এক একটি শক্তি-অবস্থায় যত খুশি তত সংখ্যক বোসন কণিকা থাকতে পারে। কিন্তু ফার্মিয়ন এটি পারেনা, একটি শক্তি অবস্থায় দুটির বেশি ফার্মিয়ন থাকতে পারেনা, বাড়তিটিকে উচ্চতর কোন শক্তি অবস্থায় যেতে হবে যাকে পরমাণুর আলোচনায় বর্জন নীতি হিসেবে আগেই দেখেছি। এর ফলশ্রুতি হলো একই স্থানে অনেক বোসন থেকে সেগুলো শক্তি বাহক হিসেবে কাজ করতে পারে। অন্য দিকে ফার্মিয়নগুলোকে যেহেতু পর পর উচ্চতর শক্তি অবস্থায় যেতে হয় এই কণিকাগুলোর সমন্বয়ে একটি পরমাণুর বিস্তৃত অবয়ব নেয়া সম্ভব হয়। তাই ফার্মিয়নগুলোই পরমাণুর তথা বস্তু গঠনের কণিকা। কণিকাদের নানা পরিবারে– কোয়ার্ক, ইলেকট্রন ও ইলেকট্রনতুল্য কণিকা, এবং ইলেকট্রন-নিউট্রিনো ও তার তুল্য কণিকাদেরকে আমরা এভাবে দেখেছি বস্তু কণিকা হিসেবে। আর বোসনদের দেখেছি গেজ বোসন হিসেবে শক্তির বাহক হিসেবে– ফোটন, গ্লুয়ন, W এবং Z ।

একই শক্তি অবস্থায় অনেক বোসন এক সঙ্গে থাকতে পারে বলে বোসন কণিকায় গড়া কোন কোন তরলের গড়িয়ে যাওয়ার অস্বাভাবিক বেশি প্রবণতা থাকে, এমনকি নিজে নিজে পাত্রের গা বেয়ে উপচে পড়তে পারে– যাকে বলা হয় সুপার ফ্লুইড। সাম্প্রতিক কালে এই বিষয় নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে।

ফার্মিয়ন অবশ্য একেবারে মৌলিক কণিকায় সীমাবদ্ধ নয়– একাধিক মৌলিক কণিকার সমন্বয়ে গড়া প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদিও ফার্মিয়ন। যাদের সমন্বয়ে গড়া তাদের স্পিন যোগ করে এদেরও পূর্ণ সংখ্যার অর্ধেক স্পিন হওয়া, একই শক্তি অবস্থায় দুটির বেশি না থাকতে পারা ইত্যাদি ফার্মিয়নের সব গুণ। একই ভাবে বোসনও শুধু মৌলিক কণিকায় সীমাবদ্ধ নয়। ওদের সমন্বয়ে গড় কণিকাও বোসন হতে পারে– যেমন মেসন, এমন কি কোন কোন গোটা পরমাণুও। এদের বোসনের সব গুণ রয়েছে। এমনকি দুটি ইলেকট্রনও বিশেষ পরিস্থিতিতে জোড় বেঁধে একত্রে একটি বোসনের মত কাজ করে সুপার-কন্‌ডাক্টিভিটি বা অতি-পরিবাহিতা সৃষ্টি করতে পারে- যা কিনা বিদ্যুৎ কারেন্টের কোন বাধা না পেয়ে অক্ষয় হয়ে থাকার ব্যাপার। অতি শীতল অবস্থায় কোন কোন বস্তুতে এভাবে দুটি ইলেকট্রন সমন্বিত ভাবে কাজ করে কুপার পেয়ার নামক বোসনে পরিণত হয়, এরকম সবগুলো তখন নিম্নতম একই শক্তি অবস্থার থাকতে পারে বলে অতি-পরিবাহিতা ঘটে। ক্ষয়হীন বিদ্যুৎ সঞ্চালন, ঘর্ষণহীন ট্রেন-চালনা ইত্যাদি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই অতি-পরিবাহিতা যুগান্তর আনছে।

তবে মৌলিক বোসনের ক্ষেত্রেও আমরা একটির কথা এখনো বলিনি– যার নাম হিগ্‌স বোসন। এটি কিন্তু গেজ বোসনগুলোর বাইরে। এই বোসনের ধারণাটি এসোছিল ১৯৬৪ সালে হিগ্‌সের তত্ত্ব থেকে। এই তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে আদিতে কণিকায় ভর সৃষ্টি হলো কেন, দুর্বল বলের কার্যকর হবার দূরত্ব এত কম কেন, ইত্যাদি অনেক কিছুকে। আসলে ষ্ট্যান্ডার্ড মডেল বলে পরিচিত কণিকাবিদ্যার প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের বেশ কিছু বিষয় হিগ্‌সের ঐ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করছে। কাজেই হিগ্‌স বোসনের বাস্তব অস্থিত্বের উপর নির্ভর করছিল কণিকা জগতের স্থাপিত শৃঙ্খলার বাস্তবতা– এটি এতই জরুরী বিষয়। হিগ্‌সের তত্ত্ব অনুযায়ী এই বোসনের যে স্থায়ীত্বকাল, যে ভর, যে শূন্য স্পিন, শূন্য বৈদ্যুতিক চার্জ হওয়া উচিত; এবং অবক্ষয়ের পর যে পরিণতি হবার কথা ঠিক ঐ সব আলামত মনে রেখে একে বাস্তবে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হচ্ছিল দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু ঐ সব গুণের পরিপ্রেক্ষিতে এই উদ্ঘাটন ঘটতে পারে একমাত্র অতি উচ্চ শক্তির অবস্থায়, যে অবস্থা বিরাজ করছিল মহাবিশ্ব সৃষ্টির একেবারে প্রথম মুহূর্তগুলোতে। আসলে ঐ মুহূর্তগুলোতেই হিগ্‌সের তত্ত্ব অনুযায়ী কণিকার ভরের আয়োজনে মূল ভূমিকা পালন করছিল এই হিগ্‌স বোসন। এমন উচ্চ শক্তি পাওয়ার প্রথম সুযোগ ঘটেছে সম্প্রতি ও জেনেভার সার্নে লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার সক্রিয় হবার পর। এই অত্যন্ত ব্যয়বহুল কণিকা ত্বরকের প্রাথমিক দায়িত্বগুলোর একটি ছিল হিগ্‌স বোসনের উদ্ঘাটন চেষ্টা। আর ২০১৩ সালের মার্চ মাসে এই উদ্ঘাটন হয়েছে বলেই বিজ্ঞানীদের ধারণা, কারণ এখানে প্রোটন প্রোটন সংঘর্ষে সৃষ্ট অতি উচ্চ শক্তির পরিবেশে এই কণিকার স্পষ্ট আলামতগুলো দেখা গেছে, এবং বিশ্বের কণিকাবিদরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন যে তাঁদের তত্ত্ব ষ্ট্যান্ডার্ড মডেলের সত্য হবার পথে আর কোন বাধা বোধ হয় আর রইলোনা। বিজ্ঞানীদের এই আস্থার প্রকাশ ঘটিয়ে এই উদ্ঘাটনের পর পরই ২০১৩ সালের পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে পিটার হিগ্‌স ও ফ্রাঁসোয়া এঙ্গলার্টের জন্য, বহু বছর আগে এর ভবিষ্যদ্বাণী করে তাত্ত্বিক আবিষ্কারের জন্য।

মৌলিক শৃঙ্খলা: প্রতিসাম্য

ইতোমধ্যে আমরা ধীরে ধীরে ষ্ট্যান্ডার্ড মডেলের নানা অংশের কথা জেনে ফেলেছি। এর মধ্যে রয়েছে বস্তু-কণিকার দল– ঐ যে তিন পরিবারের সদস্যরা; শক্তি-বাহক কণিকার দল– গেজ বোসনগুলো; আর একাকী হিগ্‌স বোসন। বস্তু-

কণিকার দলে রয়েছে লেপটনগুলো আর কোয়ার্কগুলো। ছয়টি লেপটনের মধ্যে তিনটি ইলেকট্রন জাতীয়– ইলেকট্রন, মিউয়ন, ও টাউ; ইলেকট্রন পরমাণুতে পাওয়া যায়, বাকি অন্যত্র। অন্য তিনটি ইলেকট্রন-নিউট্রিনো জাতীয়– ইলেকট্রন-নিউট্রিনো, মিউয়ন নিউট্রিনো, ও টাউ-নিউট্রিনো। প্রথমটি পরমাণুতে পাওয়া যায় বাকি অন্যত্র। ছয়টি কোয়ার্কের মধ্যে আপ ও ডাউন– এই দুটি পরমাণুর

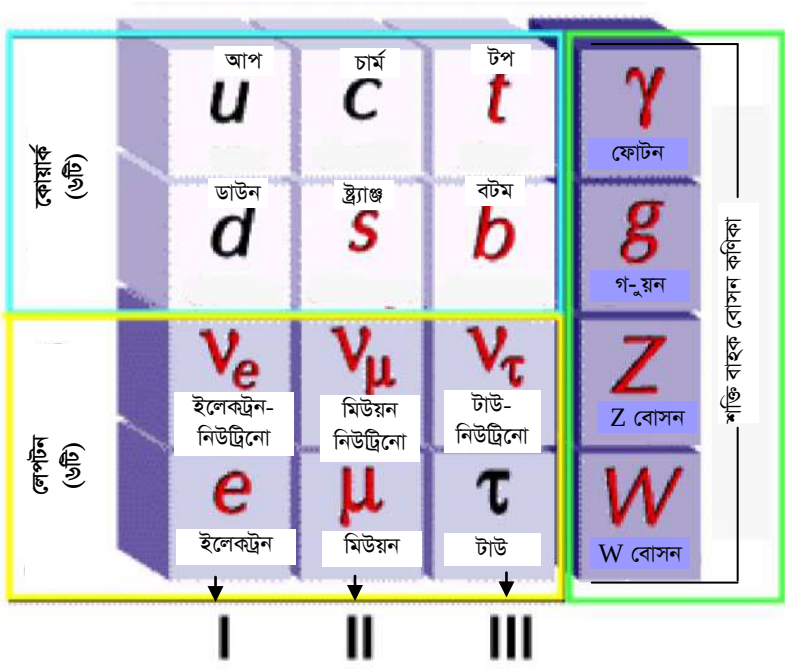

বস্তু কণিকার তিন পরিবার

স্ট্যাণ্ডার্ড মডেলে বিভিন্ন দলে কণিকা বিন্যাস।
এখানে দেখানো হয়নি গুরুত্বপূর্ণ একক বোসন সম্প্রতি উদ্ঘাটিত হিগ্স বোসন।

নিউক্লিয়াসে পাওয়া যায় প্রোটন আর নিউট্রন গড়তে, বাকিদের অর্থাৎ চার্ম, স্ট্রাঞ্জ, টপ ও বটম কোয়ার্কের উপস্থিতি অন্যত্র। এই বস্ত-কণিকাদের সবই ফার্মিয়ন– অর্থাৎ এনরিকা ফার্মির সংখ্যায়ন মেনে চলে। শক্তি বাহক কণিকাগুলো সবই সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সংখ্যায়ন মেনে চলে, তাই এরা সব বোসন। এই দলে আছে ফোটন (বিদ্যুৎ চৌম্বক শক্তির বাহক), গ্লুয়ন (নিউক্লিয়ার সবল বলের বাহক) এবং W ও Z কণিকা (উভয়ে নিউক্লিয়ার দুর্বল বলের বাহক) আর সর্বশেষ

একাকী কণিকাটিও একটি বোসন– হিগ্‌স বোসন যার উপস্থিতি অতি সম্প্রতি প্রমাণিত না হলে এই ষ্টান্ডার্ড মডেলটি প্রতিষ্ঠিত পারতোনা।

সিরিজের প্রথম বইতে আমরা বিজ্ঞানের জগতে প্রতিমসাম্যের বিষয়টির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। আধুনিক কণিকাবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিসাম্যের ধারণাটি আরো বিস্তৃত হয়েছে। চিত্র-কলায়, বা অন্যান্য দৃশ্য নান্দনিকতায় আমরা সব আকৃতির মধ্যে প্রতিসাম্য দেখতে সহজাত ভাবেই পছন্দ করি। যেমন একজন মানুষের প্রতিকৃতিতে বাম পাশের সঙ্গে ডান পাশ হুবহু না মিল্‌লে আমরা অস্বস্থি বোধ করি।

বিজ্ঞানীরাও সেরকম তাঁদের তত্ত্বে প্রতিসাম্য খোঁজেন। বিজ্ঞানের যে প্রতিসাম্যের বিষয়গুলো আমরা আগের বইয়ে দেখেছি সেগুলো না থাকলে বৈজ্ঞানিক ভাবে চিন্তা করাটাই দুরূহ হতো– সেজন্য এগুলো খুব মৌলিক। যেমন দেখেছি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গেলে পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলো সেখানে বদলে যায়না– অর্থাৎ এ নিয়মে স্থানিক প্রতিসাম্য রয়েছে। তা না হয়ে যদি এসব নিয়ম স্থানীয় কালচারের মত এক এক স্থানে এক এক রকম হতো তা হলে পদার্থবিদরা দারুণ গোলযোগে পড়ে যেতেন। সে রকম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হয়না বলে এসব নিয়মের মধ্যে কালগত প্রতিসাম্যও রয়েছে। যে কোন দিক থেকে দেখলে নিয়মগুলো একই ভাবে বজায় থাকে বলে এদের কৌণিক প্রতিসাম্যও রয়েছে। আমরা আরো দেখেছি এসব প্রতিটি প্রতিসাম্যের সঙ্গে এক একটি জিনিসের নিত্যতা জড়িয়ে আছে। স্থানিক প্রতিসাম্য আছে বলেই বস্তুর ভরবেগ নিত্য থাকে, কৌণিক প্রতিসাম্য রয়েছে বলে কৌণিক ভরবেগ নিত্য থাকে, কালগত প্রতিসাম্য রয়েছে বলে শক্তি নিত্য থাকে।

মৌলিক কণিকার জগতেও প্রতিসাম্যের ধারণাগুলো শুধু বিষয়টিকে চমৎকার গাণিতিক সৌন্দর্য দেয়নি, বরং বিজ্ঞানীদেরকে তাঁদের আবিষ্কারে যথেষ্ট সহায়তা দিয়েছে। প্রতিসাম্যকে অনিবার্য বলে ধরে নিয়ে তাঁরা একে আবিষ্কারের জন্য একটি পথ নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ষ্ট্যান্ডার্ড মডেলে শুরুতে শুধু আপ ও ডাউন কোয়ার্ক আবিস্কৃত হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু এতে লেপটনের সংখ্যা ছয়টি তাই প্রতিসাম্যের খাতিরে বিজ্ঞানীরা মনে করেছেন কোয়ার্কও আরো চারটি থাকা সঙ্গত। পরে গবেষণা তাই প্রমাণ করেছে। এখানেও অনেক সময় কোন কিছুর নিত্যতাই একটি বিশেষ প্রতিসাম্য নির্দেশ করে। যেমন কণিকাগুলো যখন উচ্চ শক্তি বিক্রিয়ার মাধ্যমে অবক্ষয়িত হয় অথবা সৃষ্টি হয়, ঐ বিক্রিয়ায় কণিকার কিছু কিছু গুণের মোট ফল নিত্য থেকে যায়। যেমন প্রোটন নিউট্রন

জাতীয় কণিকাগুলোকে সাধারণভাবে বেরায়ন বলা হয় এবং বেরায়ন নম্বর বলে একটি বৈশিষ্ট এদের ক্ষেত্রে হয় ১, এবং অন্যান্য সব কণিকার ক্ষেত্রে হয় ০। এখন যে কোন বিক্রিয়াতে বেরায়ন নম্বরকে নিত্য থাকতে হয়– এটি এক ধরনের প্রতিসাম্যের লক্ষণ। তেমনি বৈদ্যুতিক চার্জ এমনি একটি গুণ যা বিক্রিয়ার মধ্যে নিত্য থাকে। অন্যান্য চার্জের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। আরো সম্প্রতি কণিকা সমূহের মধ্যে আরেকটি গুণ আবিষ্কার করেছেন গেলম্যান ও নিশিজিমা– যার নাম অদ্ভূত ভাবে ষ্ট্র্যাঞ্জনেস (অর্থাৎ বিজাতীয়তা)। নানা কণিকার এই ষ্ট্র্যাঞ্জনেস এর মান নানা রকম দেখা গেছে। এটি বিদ্যুৎ চৌম্বক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এবং নিউক্লিয়ার সবল বলের বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে নিত্য থাকে; কিন্তু দুর্বল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে নিত্য থাকেনা। প্রতিসাম্যের এরকম ব্যতিক্রম দুর্বল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আরো দেখা যায়।

কণিকা জগতে আরো একটি বড় প্রতিসাম্য আমরা দেখেছি– তা হলে কণিকা ও প্রতি-কণিকার মধ্যে প্রতিসাম্য। একটি কণিকা যদি থাকে তা হলে তার একটি প্রতি-কণিকাও থাকা স্বাভাবিক। কণিকাতে গড়া যেমন পরমাণু, ঐ কণিকাগুলোরই প্রতি-কণিকা দিয়ে তেমনি গড়া প্রতি-পরমাণু। কিন্তু দুর্বল বলের বিক্রিয়ায় এই কণিকা-প্রতিকণিকা প্রতিসাম্য ভঙ্গ হতে পারে। অতীতে এমনি ভঙ্গের কারণেই যে প্রতি-কণিকা সাধারণ প্রকৃতি থেকে বিদায় নিয়েছে সেটি আমরা দেখেছি।

নিউক্লিয়াসে বীটা অবক্ষয়ের সময় একটি ইলেকট্রন ও একটি ইলেকট্রন-নিউট্রিনো নির্গত হয়, এবং এরা পরস্পর বিপরীত দিকে নির্গত হয়। ধরা যাক এই ঘটনাটি আমরা আবার আয়নায় প্রতিবিম্ব হিসেবে দেখছি। সেখানেও আমরা ইলেকট্রন ও নিউট্রিনোকে বিপরীত দিকে যেতে দেখবো। কিন্তু নিউক্লিয়াসের ঘূর্ণন দিকের সঙ্গে এদের নির্গত হবার যে সম্পর্ক আসল ঘটনায় থাকবে, আয়নার প্রতিবিম্বে কিন্তু তা বিপরীত ভাবে দেখা যাবে। যেমন আয়নার প্রতিবিম্বে আমরা আমাদের ডান হাতকে বাম হাত হিসেবে দেখি অনেকটা সেভাবে। কিন্তু এই দুর্বল বলের বিক্রিয়াটি মূল ঘটনায় যেভাবে আশা করছি সে ভাবে প্রকৃতিতে পাওয়া গেলেও প্রতিবিম্বে যেভাবে আশা করছি সেভাবে কিন্তু প্রকৃতিতে পাওয়া যায়না। এটি কিন্তু প্রতিসাম্যের একটি ব্যতিক্রম। অথচ সবল বল বা বিদ্যুৎ-চৌম্বক বলের বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে কোন ঘটনা যা দেখা যায় তার প্রতিবিম্ব ঘটনাও প্রকৃতিতে প্রত্যাশিত রূপেই দেখা যায়। এই প্রতিসাম্যটিকে বলে প্যারিটি বজায় থাকা। বীটা অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে, প্যারিটি লঙ্ঘিত হতে দেখা গেছে।

পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কারণ প্রতিসাম্যের ব্যতিক্রমটি পদার্থবিদ্যা আশা করেনা।

আমরা চারটি আলাদা আলাদা বলকে বিভিন্ন ভাবে কাজ করতে দেখেছি– নিউক্লিয়ার সবল বল, বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল, নিউক্লিয়ার দুর্বল বল, এবং মহাকর্ষ বল। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখন এদের মধ্যে একটি সাম্য সৃষ্টি করে এদের যতগুলোকে সম্ভব একীভূত তত্ত্বের মধ্যে আনার চেষ্টা করছেন। এরকম একীভূত করার সাফল্য হলো এক ধরনের নূতন প্রতিসাম্য সৃষ্টি। আমরা দেখেছি যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক ও দুর্বল-বলের ক্ষেত্রে এই একীভূতীকরণ ইতোমধ্যেই সম্ভব হয়েছে– সালাম, ভাইনবার্গ ও গ্ল্যাশোর কল্যাণে। কণিকা ত্বরকে যে ধরনের এক্সপেরিমেন্টে W ও Z কণিকা আবিষ্কারের মাধ্যমে তাঁদের তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে– সেখানে যে অতি উচ্চ শক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে সেই পরিবেশে বিদ্যুৎ-

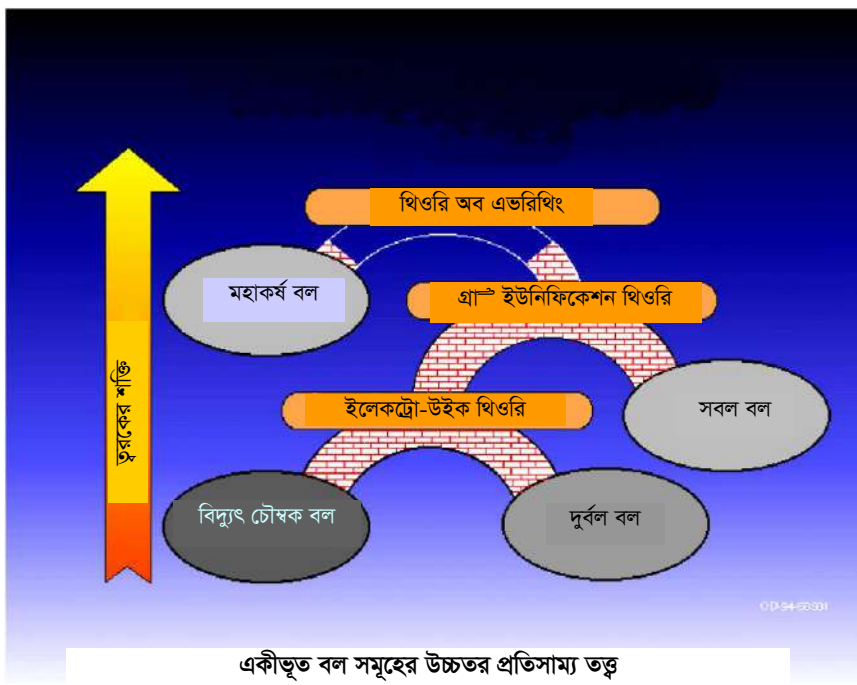

একীভূত বল সমূহের উচ্চতর প্রতিসাম্য তত্ত্ব

চৌম্বক বল ও দুর্বল বল আসলে একই বল হিসেবে কাজ করতো, অর্থাৎ এদের মধ্যে প্রতিসাম্য ছিল। মহাবিশ্বের ইতিহাসে একটি পর্যায় পর্যন্ত এরকম পরিবেশ প্রকৃতিতে ছিল, এই প্রতিসাম্যও তখন ছিল, পরে সেটি ভঙ্গ হয়েছে। এখন গ্রান্ড

ইউনিফিকেশন থিওরি (মহা একীভূত তত্ত্ব) নামে একটি তত্ত্ব রয়েছে যা সবল বলকেও এই সার্বিক প্রতিসাম্যের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছে, এবং মনে করছে যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির গোড়ার দিকে তিনটি বলের মধ্যেই এই প্রতিসাম্য প্রকৃতিতে ছিল। কিন্তু এখনো ঐ রকম পরিবেশে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারছিনা বলে গ্রান্ড ইউনিদিফকেশন থিওরি এখনো প্রমাণিত নয়। এটি এবং মহাকর্ষকে অন্তর্ভূক্ত করে আরো উচ্চাকাঙ্খী– থিওরি অব এভরিথিং (সব কিছুর তত্ত্ব) যদি সম্ভব হয় তখন কণিকা জগতের মধ্যে আরো সর্বব্যাপ্ত আরো সুন্দর প্রতিসাম্য দেখা দেবে। এর একটি চেষ্টা চলছে ষ্ট্রিং থিওরি নামে পরিচিত তত্ত্বের গবেষণায়।

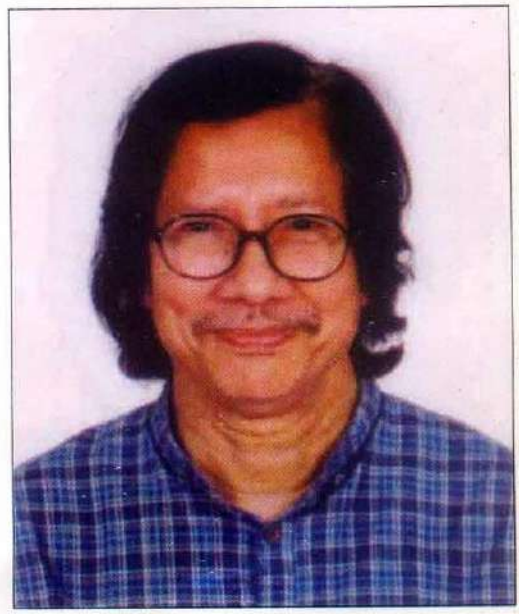

পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। বিজ্ঞান লেখক। অর্ধশতাব্দী ধরে প্রকাশিত মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকীর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের (সিএমইএস) প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার। বিজ্ঞান সাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার সহ বিভিন্ন স্বীকৃতি প্রাপ্ত লেখক।